নীরঞ্জনা

কানাই সামন্ত

পৌষ

১৩৬১

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড্ সন্স্ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা, ১২

মূল্য ৪

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড্ সন্স্ লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট। কলিকাতা, ১২

মুদ্রক : শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস। ৩০, কর্নওআলিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা,

লেখকের নিবেদন

আমার এই সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ উই ইঁদুর ভোগ করবেন অথবা বাঙালি পাঠক পাঠিকা সে আমার জানা নেই। কিছু একটা বলব ব'লে বাল্য থেকে যৌবন অবধি সুর সেধেছি, যন্ত্র বেঁধেছি। ভূমিকা হয়েছে হয়তো, বলা হল না। সমস্তটাই ভ্রান্তিবিলাসমাত্র। দেশ কাল পাত্র কিছুই অনুকূল বা উপযোগী নয়।

উপরেরটুকু লেখকের স্বগত উক্তি। সেই সঙ্গেই বলি, ছন্দোবদ্ধ বাক্যের সুরে ও ব্যঞ্জনায় খামোকা খুশি হয়ে ওঠার অ-সাধারণ শক্তিতে এপর্যন্ত দুটি লোক আমায় অপরিমিত উৎসাহ দিয়েছেন। এক জন ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন ; আমার বহু ভাগ্যে আরএক জন আজও আছেন, অশীতিবর্ষোত্তীর্ণ তাঁর আন্তরিক তারুণ্য তরুণজনেরও স্পৃহনীয়। এঁদের স্মরণ করি, এঁদের কাছে আমার শ্লাঘ্য ও অপরিমেয় খুশির ঋণ আমি স্বীকার করি।

কবিতাগুলির নির্বাচনে বন্ধুবর শ্রীশুভেন্দু ঘোষ উদার এবং অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন। তেমনি শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অগ্রজ কবি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, সুরসিক শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী এঁরাও অভয় দিয়েছেন ও প্রসন্ন অনুমোদন জানিয়েছেন বারংবার, সে আমার বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে। প্রচ্ছদে ব্যবহারের জন্য ছবি দিয়েছেন আমার পরম পূজনীয় আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু।

শ্রীরামেশ্বর দে, শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, শ্রীমানবেন্দ্র পাল ও শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত মুদ্রণসংক্রান্ত সকল ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করে ঋণী করেছেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারী এবং তাঁর কর্মীগণ যে ক্ষিপ্রতা পটুতা ধৈর্য ও সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা দেখিয়েছেন সেও আমার আশাতীত।

তবু, 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না'। যেটি চেয়েছি সেটি হয় নি। এই গুরুমন্ত্রই কানে নিয়েছিলেম, আজ প্রাণেও নিলেম—

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ, থাকবে না ভাই কিছু
সেই আনন্দে যাও রে চলে কালের পিছু পিছু।

১৩৬১
রাসপূর্ণিমা

এই গ্রন্থে ’ চিহ্নের ব্যবহার বিচিত্র, বর্ণলোপ বোঝাতে অল্পই, স্বরান্ত উচ্চারণ বোঝাতে বেশির ভাগ— সেই স্বরটি ব্যঞ্জনলগ্ন অ, ও, অথবা উভয়ের মাঝামাঝি কিছু। যেখানে চিহ্ন না থাকলেও অকারান্ত উচ্চারণ স্বতঃসিদ্ধ সেখানেও চিহ্ন দেওয়া বিশেষ ক’রে ওকার-ঘেঁষা উচ্চারণেরই আকাঙ্ক্ষায়। নীরব’স্তব’ পুষ্পপুঞ্জ পীযূষ’হিয়া : এ ক্ষেত্রে নীরব্‌স্তব্‌, পীযূষ্‌-হিয়া এরূপ উচ্চারণ নিবারণ-পূর্বক, ব, ষ ব্যঞ্জনগুলিতে যেন অকারান্ত উচ্চারণ হয় সেরূপ নির্দেশ দেওয়াই চিহ্ন দেওয়ার অভিপ্রায়; অন্য দিকে করে পদের does এই অর্থে একরূপ উচ্চারণ; ক’রে লেখার উদ্দেশ্য, প্রথম ব্যঞ্জনটি যে ওকারান্ত এইটুকু জানানো। বিভিন্ন তৎসম শব্দ সমাসবদ্ধ থাকলে ঠিক ঠিক দেবভাষার অনুযায়ী স্বরান্ত উচ্চারণ বাংলার সাধু ও সাধারণ রীতি এবং এমনিতেই পতিত, অতীত, সংহত, উত্থিত, সিত (শোণিত, শীত ইত্যাদি ব্যতিক্রম) প্রভৃতি ত-অন্ত শব্দে শেষ ব্যঞ্জনটির স্বরান্ত উচ্চারণও বাংলাদেশীয়। আবার, পদের মাঝখানে হাইফেন চিহ্নটি থাকলে তৎপূর্ববর্তী অকারন্ত ব্যঞ্জনের স্বরলোপের একটা সম্ভাবনা থাকেই, প্রয়োজনবোধে সেজন্য, হেম’-নূপুরে বা মদ’ -মুকুলিত এরূপ ছাপতে হয়েছে; আশা করি স্বরের প্রতি লেখকের পক্ষপাত ইলেকের ইশারাতেই পরিস্ফুট। আরও আশা করি, রচনার ছন্দ এবং শ্রুতিমাধুর্য আবিষ্কার করা, রক্ষা করা, লেখক এবং পাঠক উভয়ের যৌথ দায়।

বিভিন্ন রচনা নিয়ে বিশেষ বক্তব্য, পৃষ্ঠা এবং প্রয়োজন হলে ছত্রের উল্লেখ-সহ :—

৮।৯ ছত্রটি সুকবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের সুপরিচিত বাক্য।

৪৮।২ ‘উত্তরঅয়নারূঢ় রবি’ যে কেবল আকাশের নয়, পৃথিবীরও, এটুকু বলার প্রয়োজন আছে?

৭৮।১৮-১৯ ‘নীল যে বিহঙ্গ’ মেটারলিঙ্কের ব্লু-বার্ড্‌।

৮৩।২৪-২৬ মন্তব্য : It is not true that the chair stands; it is held; otherwise it would fly away and unite with the Spirit.

Franz Marc (1880-1916)

৮৫ শেষ ছত্রে ‘হিমঝুরি-বীথিকার কবি’ রবীন্দ্রনাথ।

১১২।২ শ্যামঝুরি : ‘চিত্রোৎপলা’ গ্রন্থে ৪২ পৃ ৩-৫ ছত্রে ব্যাখ্যাত।

১৩৬।১-২	রবীন্দ্র-রচনার যথাযথ উদ্‌ধৃতি ঘটে নি।
১৪৬	সলি : আধ মণ। মাঝি, মেজেন : সাঁওতাল পুরুষ, রমণী।
১৫২।৯	সুগন্ধপর্ণী : য়ুকালিপ্‌টাস।
২০৬।২৫	শঙ্খচাঁপা : গোলক-চাঁপার সগোত্র, শুভ্রতর, পেলবতর।
২০৯-১০	পৃষ্ঠায় লহর : অড়র।
২১৫	পৃষ্ঠায় আঁধের, বিহান, সকাল, সমার্থক।
২৪৫-৪৬	দুটি কবিতা কবি সরোজিনী নাইডুর ইংরেজি থেকে।
২৫৮।৭	ভাব : mood .
২৬৯	জাপ কবি নোগুচির একটি কবিতা অনূদিত হয়েছে।

পরিশেষে বক্তব্য, অল্প বা অধিক পাঠপরিবর্তনের প্রয়োজনে পূর্বপ্রকাশিত কয়েকটি কবিতা এ গ্রন্থে পুনরায় সংকলন করা হল : স্বপ্নশেষ (পৃ ১০৭) অনির্বচনীয় (পৃ ২৫২) 'উষসী' গ্রন্থ থেকে ; মুকুর (পৃ ২৬৫) আলোছায়া (পৃ ২৬৮) 'রূপমঞ্জরী' থেকে। এটুকুও বক্তব্য, লেখকের 'গীতমঞ্জরী' ও 'চিত্রোৎপলা' (১৩৫৩) অধুনা দুষ্প্রাপ্য। 'গীতমঞ্জরী'র সব কবিতাই এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হল। 'চিত্রোৎপলা' বা 'উষসী'র পুনর্মুদ্রণ লেখকের ভাবনা-বহির্ভূত ; কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ এখানেই বিজ্ঞাপিত করা ভালো— চিত্রোৎপলা : ৯২ পৃ. ১৫ ছত্রে আলোছায়াসম নয়, আলোছায়াময় ; ৯৪ পৃ. শেষ ছত্রে পাখা না হয়ে ডানা হবে। উষসী : ২০ পৃ. ১৩ ছত্রে প্রজ্বলন্, উজ্জ্বলন হওয়াই ঠিক ; ৮৩ পৃ. ২১ ছত্রের শেষ পদটি পরবর্তী ছত্রের প্রথমেই অপ্রস্তুত, অপদস্থ আছে ; ৯৯ পৃ ৫ ছত্রে একটি হাইফেন বসিয়ে হবে, শ্রীচরণ-স্পর্শ-কাম ; ১০০ পৃ ১৯ ছত্রের প্রথমেই, নিঃসীম গ্রন্থবিশেষে ঃসীম বা সীম হয়েছে।

নির্ভুল ছাপা হওয়া বাংলা বইয়ের রীতি নয় শুদ্ধিপত্র-ব্যতীত তার truth বা beauty খোলে না। উপরন্তু আজকালকার হরপ-নির্মাতারা নানাভাবেই নারাজ ; তাই ছাপা হতে হতে হরপ ভাঙে সহজেই, ছুটে যায় দিগ্‌বিদিকে— ব্যাপারটা পরিণামরমণীয় হয় না। উ, ঊ, ু, ূ এগুলির পার্থক্য অনুবীক্ষণযোগে (অন্তত প্রুফে) দ্রষ্টব্য ; চন্দ্রবিন্দু বা রেফ শূন্যবাদী, তাঁরা প্রায়ই শূন্য স্থান রেখে শূন্যে বিলীন হয়ে যান। যা হোক, এ বইয়ের সংশোধনযোগ্য মুদ্রণপ্রমাদ যা চোখে পড়েছে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ; দুটি ক্ষেত্রে পাঠ-বদলের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

কহত প্রাণ স্থন কায়া মেরী
মোর তোর সংগ ন হোঈ।
তোহি অস মিত্র বহুত হম পায়া
সংগ ন লীনা কোঈ॥

—কবীর

রচনা প্রধানতঃ

১

‘নিখিল ভুবন রঞ্জিত করো
নিখিলের প্রাণ’চেতনা !
আলোছায়াময়ী, অয়ি মায়াময়ী,
নিখিলের সুখ’বেদনা !
তোমারে কে বলো রঞ্জিত করে—
আনন্দধারা, চেতনার ধারা,
অয়ি নিরাকারা…
নীরঞ্জনা !

৩০. ৭. ১৩৯১

কবিতাবধূ

ছলনাময়ী গো কবিতাবধূ,
ঘর গড়ে আর ঘর করে সুখে সতীশ যদু
সুশীলা, সরলা, সারদা, সুখদা ঘরণী লয়ে।
এ হতভাগ্যে উদয় হয়ে
অহেতুক সুখে অহেতুক দুখে
আমারে হাসালে কাঁদালে শুধু।
তেপান্তরের মরুপ্রান্তর
সমুখে নিয়ত করিছে ধুধু।
আমারই কপালে ছিল এ লিখা
সেই অনন্তে হে মরীচিকা,
তোরে অনুসরি হারাব দিশা
দিবস-নিশা?

ছলনাময়ী গো কবিতাবধূ,
ভাত ডাল শাক কুমড়া কদু
জঠরের জ্বালা ঘুচায়। ···আহা,
রাজৈশ্বর্য কাঞ্চনমণি মুকুতা, তাহা
ধূলার সমান তুচ্ছ গণি
খনে খনে দেখা দাও যেমনি
পিক-পাপিয়ার কাকলিরোলে
মলয়অধীর পুষ্পদোলে,
প্রাচী ও প্রতীচী -গগন-কোলে,
সুনীল-সবুজ আঁচলখানি
কনকঅরুণকারুনিখচিত অঙ্গে টানি,
আলোকে ছায়ায় জোছনামায়ায়
আধো হাসি আধো চাহনি হানি—

অশ্রুত অপরূপ কী সুরে
ডাক দিতে দিতে মিলাও দূরে।

ছলনাময়ী গো কবিতাবধূ,
আলিঙ্গনে তো বাঁধিবার নও : অধরমধু
কভু অস্বপ্ন তন্দ্রাঘোরে
অধরে কি ঢেলে দিয়েছ মোরে?
জাগরণে একি দহনজ্বালা
নিশিদিন তুমি দিতেছ বালা!
সহজ সুখের দুখের পালা
সহজ হাসি ও কান্না -ছলে
তাও যে ফুরাতে পারি না : তুমি কী মন্ত্রবলে
সুখ ভরে দাও দীর্ঘশ্বাসে ;
দূর আনন্দলোকের পাশে
গানের সুরের ডানায় ভাসে
প্রাণের গভীর বেদনাখানি
কেন না জানি!

কবিতাবধূ গো ছলনাময়ী,
কাজের জগতে মিছে আসা মোর—
কোনো-কিছুরই তো যোগ্য নহি ;
দূর নিশ্বাসে তাই কি ভরি
শতছিদ্র এ জীবন মরি
বাজালে আমায় করুণা করি!
সুরের স্বর্গে দীপ্তিমতী
তুমি গো ধন্য, ধন্য সতী!

বোলপুর
১৬ ভাদ্র ১৩৪৮

শিহরণ

শিউরে ওঠে আমার আকাশ
আমার ভুবন
নাম-না-জানা সুখে
শিউরে ওঠে আমার জনম
আমার মরণ
গোপন গূঢ় বুকে।
শিউরে ওঠে বনফুলের বাসে,
শিউরে ওঠে শিশির-ঝলা ঘাসে,
শিউরে ওঠে— আমার শুকতারা
রাত-প্রভাতে হায় গো নিমেষহারা
চায় যবে মোর মুখে।
বিস্ময়ে কৌতুকে
আন জনমের স্বপ্ন আমার
শিউরে ওঠে
এই জনমের বুকে।

বোলপুর
৮ চৈত্র ১৩৪৩

মালতী

মালতীলতায় ফুল ধরিয়াছে কেমনে ভুলি ?
আজি এ প্রভাতে বাদল-বাতাসে
পুন যে পরান উঠিল দুলি।
ভেবেছিনু প্রীতিগীতিউৎসব
নয়নের জলে সারা হল সব,
চিতসঞ্চিত বিত্তবিভব
হল সে ধূলি।

মালতী

মালতীলতায় ফুল ফুটিবে যে
হায় সে কথা কি ছিলেম ভুলি !

ওরা কি জানে না যারে কৈশোরে বেসেছি ভালো
তাহারে ছাড়িয়া বিনা মেঘে মোর
ম্লান হয়ে গেছে দিনের আলো !
ফুরায়েছে মোর আশাসম্বল,
স্বপনকুসুমে ঝরে গেছে দল,
অমাযামিনীর আঁধা এ কেবল
হতাশা কালো।
ওরা কি জানে না সেই সখা নেই
যারে কৈশোরে বেসেছি ভালো !

বরষে বরষে ওরা ফুটে ওঠে নবীন সুখে
শুভ্র খুশির পশরা মেলিয়া
কাননে কাননে ফুল্লমুখে।
আশাশোচনার সব দায় ভুলে,
পূবালি পবনে ওঠে দুলে দুলে,
স্রোতে ভেসে লাগে বিরহের কূলে
বিজন বুকে !
নূতন করিয়া বিহ্বল করে
চিরপুরাতন দুখে কি সুখে।

মালতীলতায় ফুল ধরিয়াছে কেমনে ভুলি ?
ওরই তালে তালে বাদল-বাতাসে
পুন যে পরান উঠিল দুলি।
কথা ভুলিয়াছি, আছে তবু সুর—
চরণচিহ্ন সুচির বঁধুর
পরানের ধূলে রয়েছে— মধুর
মধুর ধূলি।

মালতীলতায় ফুল ফুটে বলে,

তুমি ভুলিলেও মোরা কি ভুলি ?

বোলপুর
২৩ আষাঢ় ১৩৪৪

নিশিগন্ধা

আজি গো বন্ধু, যে সুরভি জাগে
অহেতুক তব স্মরণফুলে
তুমি জানিলে না, জানিলে না, বুঝি
নিঃশেষে সবই গিয়েছ ভুলে।
পার হয়ে গেছ তিমিররাত্রি
উদয়াচলের তুমি যে যাত্রী—
বাসা বাঁধিয়াছি আমি গো একাকী
এই চিরঅমাযামিনীকূলে।
ফিরে কেন তবু এ সুরভি জাগে
বন্ধু গো তব স্মরণফুলে !

বালিগঞ্জ
১০ মাঘ ১৩৪৪

প্রতীক্ষমাণা

তোমারে দেখেছি আমি, সন্ধ্যার আঁধারে
নিরানন্দ দেহলীর ধারে
আছ প্রতীক্ষিয়া।
চিনি নাই, চিনি নাই প্রিয়া !

পূতিগন্ধি বক্র শীর্ণ গলি।
দূরে দূরে উঠিল উজ্জ্বলি
নগরের বৈদ্যুত আলোক।
আবর্তিত ঘূর্ণস্রোতে চলিয়াছে লোক

প্রতীক্ষমাণা

দূরে ও নিকটে,
কোন্ মহাশূন্যে কোন্ ব্যর্থতার তটে
মৃত্যুকামনায় !
হায়,
তোমার কি মোহ নাই মায়া নাই নারী,
দাঁড়াইলে প্রান্তে এসে তারই ?
নিরুৎসুক নিরানন্দ চোখে
কপটকজ্জললেখা, রক্ত অলক্তকে
রঞ্জিত অধর ওষ্ঠ, ব্যর্থ বিভূষণ
অঙ্গে অঙ্গে করে উদ্‌ঘোষণ
নিরুদ্দেশ অভিসারে
দাঁড়াইয়া দ্বারে
তারই তরে নারী
রজতমুদ্রায় দুই-চারি
হেলায় যে করিবে গ্রহণ
বিকশিত জীবনযৌবন…
বিধাতার দান এ জগতে—
কানায় কানায় পূর্ণ হায় কত বসন্তে শরতে
পুষ্পগন্ধে কুহুস্বরে নদীকলস্রোতে
পূর্ণেন্দুআলোকে !

সে মোহিনী মূর্তি শুধু পড়েছিল চোখে
অন্যমনে পথে যেতে যেতে।
আমারে কি ছিলে প্রতীক্ষিয়া ?
হায়, কেন চিনি নাই, চিনি নাই প্রিয়া !

আমি শুধু কবি নই কল্পনাবিলাসী।
নির্বাণকামুক নহি বিরক্ত, উদাসী।
অকলঙ্ক নহি গো কুমার।
বঞ্চিত এ যৌবন আমার

প্রতীক্ষমাণা

হাহাকার করে
সংগীত উৎসারি জীর্ণ পঞ্জরে পঞ্জরে;
দীর্ঘউপবাসী
চায় দেহ, চায় প্রাণ, আত্মা অবিনাশী—
একাধারে দ্যুলোক ভূলোক
মূর্তিময় প্রাণময় প্রেমময় হোক—
সুচিরবাঞ্ছিতা নারী, অনন্যা প্রেয়সী।
হায়, সে কোথায় আছে বসি
জন্মবিরহিণী, চির রাহুগ্রস্ত শশী,
কারাকক্ষতলে?
অথবা পথের প্রান্তে? নিশি নিশি তপ্ত অশ্রুজলে
হেথা শুধু তিতিল শিথান।
স্বপ্নে স্বপ্নান্তরে শুধু নিষ্ফল সন্ধান।

কে তুমি! তুমি কি, বালা,
যৌবনলাবণ্যপণ্যা, প্রাণঘাতী মরীচিকামালা,
ব্যর্থকামকামনার অনির্বাণ চিতা
বারবধূ? হে অপরিচিতা,
নহ মাতা, নহ কন্যা, বধূ নহ তুমি—
নরকের বিষবাষ্পে উঠেছ কুসুমি
দিশাবিস্মরণী বুঝি আলেয়ার আলো?
তুলসীর মূলে নাহি জ্বালো
সন্ধ্যাদীপ, আপনারে কভু নাহি ঢালো
ধন্য করি কোনো ভাগ্যবানে
সেবায় সোহাগে সুখে প্রণয়ে কল্যাণে।
কেই বা না জানে—
যে খুশি ধরুক তব কর,
মূল্যে বিকাইবে তব কটাক্ষের শর,
চুম্বন, আশ্লেষ, নিত্য নির্লজ্জ বাসর,
তনুসর্ব প্রণয়ের ভান,

হাসি, গান,
আত্মঅপমান।
ক্লেদখিন্ন রজনীর শেষে
তন্দ্রাতুর নয়ননিমেষে
বিন্দু অশ্রুবারি
দিবে না, দিবে না দেখা, নারী,
করুণায় অথবা বিষাদে!

তবু কাঁদে…
'কাঁদে প্রিয়া উৎপীড়িতা বারাঙ্গনা-বুকে'। …
রুদ্ধ যার ভবনসম্মুখে
নরকউৎসব নিশিদিন
সে কুমারী তন্দ্রায় বিলীন
অতারক অচন্দ্রমা গূঢ়মর্মতলে।
সে কি জাগিত না তবু পূত অশ্রুজলে
শরৎশিশিরধৌত প্রসূনের সম
যদি তার চিরপ্রিয়তম
একবার দাঁড়াইত দ্বারে,
চুমিত তাহারে
দূর করি স্বপ্ন-ঘেরা ঘুম?

ত্রিদিবকুসুম
মর্তে নারী
সন্ধানে তাহারই
ফিরিয়াছি পথ হতে পথে। …
সে সন্ধ্যায় আঁধারে আলোতে
কে তুমি কাহার লাগি ছিলে প্রতীক্ষিয়া?
হায়, তোরে চিনি নাই প্রিয়া!

বালিগঞ্জ
২৪ পৌষ ১৩৪৪

ড্রয়িঙ্ রুম হইতে বিদায়

সর্ব-সাকুল্যে অন্তত
সেকেণ্ড্ সহস্রশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো
সজ্জিত ড্রয়িঙ্ রুমে। বিদায়ের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুলেখা কাহারও নয়নে
দেখে যাব, এই আশা ছিল। অশ্রুহীন
হৃদিহীন সভ্যস্বর্গভূমি উদাসীন
চেয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ সেকেণ্ড্ তাহার
চক্ষের পলক নহে সুদীর্ঘ যাহার
অবসরে (অবশ্য, পিতৃব্য-পিতামহ
ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার, অহরহ
প্রাণপাত পরিশ্রমে, ফেরঙ্গাজ্ঞাবহ
দোর্দণ্ড হাকিম-রূপে হুকুম তামিল
করি উপরওআলার, প্রাসাদ মঞ্জিল
জমিদারি জুড়িগাড়ি অথবা গ্যারেজে
শেভ্রলে সঞ্চিলা, তাই সম্ভাবিলা এ যে
অবসর) সুদীর্ঘ যাহার অবসরে
বিজ্ঞান দর্শন আর্ট্ রাষ্ট্রনীতি -'পরে
টীকা ও টিপ্পনী কত সভ্যজন করে
রাজা ও উজির বধি প্রত্যেক পলকে
সে আলোচনায়, স্মিত ওষ্ঠাধরে চোখে
বিদ্রূপ বিজ্ঞতা হর্ষ সদাই সঞ্চরে
যথাতথ (এদিক ওদিক যেবা করে
রতিমাষা-পরিমিত তারে ধিক্-ধিক্)
অস্মদীয় তিরোভাবে এ কথা তো ঠিক
সেথায় বাজে না ব্যথা অশ্বত্থশাখার
প্রান্তে জীর্ণতম পাতা খসি গেলে তার

যতটুকু ব্যথা বাজে। বেচারা অশথ,
তাঁহারে কী দিব দোষ ; তোমরা মহৎ,
তোমরা স্বতন্ত্র বিশ্বে।

মোর অভিশাপে
নৃত্যপরা রসনার পরনিন্দালাপে
(অবশ্য, সাক্ষাতে নহে) যেন নাহি ঘটে
তালভঙ্গ অকস্মাৎ টাক্‌রার নিকটে
আট্‌কাইয়া ; অথবা শাণিত চোখে চোখে
উৎসবসন্ধ্যায় যবে বৈদ্যুত আলোকে
দীপ্রতরবৈদ্যুতীর বিনিময়, আহা,
সুচতুর প্রণয়ে বিদ্বেষে, যেন তাহা
সহজ সরলভাবে পিপাসার বারি
নাহি যাচে বন্ধুপাশে ; অথবা··· অধিক
'অথবা'য় কিবা কাজ— ওগো চতুর্দিক
টেবিল-আল্মারি-কৌচ-আরামকেদারা-
মুহুকণ্টকিত (উঁহু, কেবল তাহারা
আমারই আরামহর ছিল প্রতি পদে
মনে পড়ে, বারম্বার পড়িলুঁ বিপদে
উঠিতে বসিতে নিতান্ত সে পিতৃপুণ্য
খাই নি হুঁচোট, আছে অক্ষত অক্ষুণ্ণ
আড়ষ্ট অবোধ দেহ) ওগো সুসজ্জিত
সর্বদিক, ওগো সভ্যজন, সুখস্মিত
দৃষ্টি মেলি আমারে বিদায় দাও তবে।
যবে মোর একেবারে অন্তর্ধান হবে
ভুলিলেও ক্ষতি নাই ; বারেক অথবা
স্মরি এই পাড়াগেঁয়ে অতিশয়-গবা
ব্যক্তিটিরে হাসিয়ো উৎকট উচ্চহাসি,
অথবা কুঞ্চিতাধরে নাসায় উদ্ভাসি
সূক্ষ্মতম শ্লেষ, শিষ্টাচারে যাহা বলে,

'কৃষ্টি'পরাকাষ্ঠা যাহা সভ্যভূমণ্ডলে,
তেমনি মার্জিত হাসি হাসিয়ো।

শ্রীবিষ্ণু

শ্রীহরি স্মর রে মন! নিয়তবর্ধিষ্ণু
পরিহরি এ উজ্জ্বল, এ মুখর, এই
প্রাণহীন বঙ্গরাজধানী, বিজনেই
ফিরে চলো পুনর্বার। বর্ধিষ্ণু যদিও
নগর, বন্দর, রেল, বিরাজিছে স্বীয়
মহিমায় নদী গিরি বন দিকে দিকে
এ বিশ্বের; উদয়াস্ত নিমিখে নিমিখে
বিস্ময় জাগিয়া ওঠে শ্যামলে সুনীলে;
ছায়ারৌদ্র রূপরেখা গন্ধধ্বনি মিলে
প্রাণের আপন বীণা ছিনাইয়া লয়ে
হস্ত হতে তার, সেই অনন্ত আলয়ে
তারে তারে তোলে মৃদু মধুর ঝঙ্কার।
বসন্তপুষ্পিত শালবনে মধু তার
আহরিতে আসে মধুহর, সে কেবল
মধুগন্ধআমন্ত্রণে। প্রমত্ত প্রবল
ঝড় ওঠে কালবৈশাখীর অকস্মাৎ
বাধাবন্ধহারা। করি কজ্জলসম্পাত
দিগন্তে যেদিন আসে বর্ষণসময়
নীলকণ্ঠ জাগিলেন যেন মনে হয়
নীলাম্বরে; শিথিলবন্ধন জটাজূটে
দিগ্‌বিদিক ছেয়ে গেল, সুরধুনী লুটে
শূন্যে শূন্যে ঝর্ঝরিয়া, প্রলয়আঁধারে
তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি হানে বারে বারে
দীপ্র কশাঘাত; ধরা অরণ্যে প্রান্তরে
কদম্বে শিহরে, ঘন শঙ্খধ্বনি করে
শিখীকণ্ঠে। (তেমনি যে কবির হৃদয়

আনন্দের শঙ্খধ্বনি-হুলুধ্বনি-ময়
হয়তো বিস্ময়ে, বন্ধু, মেঘদূতশ্লোক,
মল্লীনাথি ভাষ্যটীকা। দ্যুলোক ভূলোক
কাব্য নিত্য নব নব ; কোন্ টীকাকার
অক্ষয় কী লেখা লিখি রাখিবে তাহার
শ্লোক গুনি গুনি ! নমি আমি কালিদাস-
রবীন্দ্রের প্রতিভারে ; অর্থের আভাস
এই বিশ্বজীবনের জানালেন তাঁরা।
তবু কি কবির কাব্য অবরুদ্ধ কারা ?
তাহার বাহিরে যার নাই রে সঞ্চার
সে মূঢ় করেছে কাব্যপাঠ ?) শারদার
আবির্ভাবে দিকে দিকে যেদিন ব্যজনী
কাশপুষ্পে দোলায় দিগ্‌বালা, আস্তরণী
শস্যশ্যাম মাঠে মাঠে, পোড়ে গন্ধধূপ
শেফালি বকুল পদ্ম, দোলে অপরূপ
শুভ্র মেঘমালা নীল চন্দ্রাতপতলে,
স্বচ্ছ রৌদ্রজ্যোৎস্নারাশি ভুবন উজ্জ্বলে
দিবানিশা— কী যেন অশ্রুত সুর শুনি
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া। অলক্ষিত গুণী
ভিন্ন রাগ দেয় পুন বেণুতে কুহরি ;
ক্রমে সে শ্যামল সুধা স্বর্ণ হয়ে, মরি,
হেমন্তিকা মূর্তিমতী ! পউষের দিন
চ্যুতপত্র, পুষ্পরিক্ত, কুহেলিবিলীন,
প্রসারিয়া অকলঙ্ক তুষারআসন
মেরুতে মেরুতে করে করে আবাহন
তপস্বীরে। তার পরে দক্ষিণসমীরে
নন্দনমন্দারগন্ধ বিতরিয়া ফিরে
আসে গো ফাল্গুনী ধরাতলে পুনর্বার ;
বসন্তপুষ্পিত শালবনে মধু তার
আহরিতে আসে মধুহর, সে কেবল

মধুরের আকর্ষণে।

উৎসুক চঞ্চল

আমার হৃদয় সেই উন্মুক্ত জগতে
ফিরে যেতে ; আজও যেথা ধূলিময় পথে
নগ্ন ধূসরিত শিশু খেলা করে ; বধূ—
অনুপ্রাসঅনুরোধে কুমড়া বা কদু
দু সন্ধ্যা রন্ধন করে সেও সত্য কথা,
আর, বেণুচ্ছায়াঘন পথে লজ্জানতা
জল নিতে মন্দপদে যায় আসে ঘাটে ;
দ্বিপ্রহরে তালবনে বেলা তার কাটে
যে রাখাল গোধন চরায় ; মাঠে মাঠে
কৃষকেরই দেহপাতে প্রাণের যতনে
শস্য ফলি উঠে আজও, কাঞ্চনে রতনে
শ্রেষ্ঠীবধূ রাজবধূ কিরণ ঠিকরে
উৎসবসভায় তাই ; কারিগর-করে
নিত্যপ্রয়োজন শত সামগ্রীসম্ভার
কারুতে খচিত দিনে দিনে। সভ্যতার
সুকৌশল সুচিক্কণ নাগপাশে বাঁধা
সর্বথা বঞ্চিত তারা ; অর্ধাশনে, দাদা,
দিন গেলে ভাবে সেও ঈশ্বরপ্রসাদ ;
উপরন্তু ঈর্ষাদ্বেষ কলহবিষাদ
তাহারও অভাব নাই কোনো। আজও তবু
(মূর্খ তারা, মূঢ় তারা, তাহাদের প্রভু—
গুরু, পুরোহিত, রাজা, ষষ্ঠী ও শীতলা,
কলওআলা, মহাজন, সুকঠিন বলা
কেবা নন) আজও তবু অবুঝ শিশুর
সারল্য তাদের প্রাণে। অবিশ্রুত সুর
সে পল্লীপ্রাণের দুঃখদৈন্যউপহত
আমারে দিবসনিশা টানিছে সতত

হেথা হতে বহু দূরে।

মা বলিতে চাই
সেথা পল্লীরমণীরে। সেথা বন্ধু ভাই
সম্বোধিব— সহজ দোসর পথ-চলা
পথিকজনের। ধর্মজ্ঞান কাব্যকলা
সকলই তো মানবের সহজউৎসার
প্রাণগোমুখীর ধারা— সমৃদ্ধি তোমার
উপচিত হোক দিনে দিনে রাজধানী!
আমারে বিদায় দাও।

পথ নাই জানি
পলাবার।··· তবে, এ কবিতা বন্ধুবরে
শুনায়ে আসিলে ক্ষতি কিবা, তাঁর ঘরে
সুধীসমাগম যবে বিরল, গোধূলি
বাতায়নপথ দিয়া অথবা ঘুল্‌ঘুলি-
অবসরে পশি একটি অরুণদ্যুতি
অজ্ঞাতে সঞ্চারে, যবে রসঅনুভূতি
চায়ের সংযোগে হয় সুমধুরতর।
এমন গোধূলি, ভালো ক'রে মনে করো
অকৃতজ্ঞ কবি, কভু কি ড্রয়িঙ্‌ রুমে
আসে না সেথায়! অহো, কল্পনাকুসুমে
সৌহৃদ্যের মধু কভু হয় না সঞ্চিত!
তাই, বিরচিলে তুমি এ অতিরঞ্জিত
কবিতা তোমার, বচনরচনোৎসবী,
ছী ছি, অকৃতজ্ঞ কবি!

বালিগঞ্জ
৬ চৈত্র ১৩৪৪

দেহ

ভালোবাসি এ দেহ আমার।

নিরবলম্বন নিরাধার
ছিনু অন্ধ অসীম গগনে;
যুগলের মিলনলগনে
নিগূঢ়-কী আকর্ষণে এ দেহের বীজে
বন্দী হনু। তার পরে আশাস্বপ্নবেদনায় সৃজে
প্রতি পদে বিচিত্র মুকতি
পাড়ি দিনু অতি
দীর্ঘ পথে।
জ্যোতিঃপ্লুত জীবনে জগতে
বিস্ময়ের সীমা নাই।
ধন্য তাই
এ দেহ যে বৃষ্টিবায়ু ধূপছায়া লেগে
মাতৃদত্ত অন্নপানে উঠিয়াছে জেগে
অস্তিত্বের এ আকাশে আনন্দের বেগে
বৃক্ষাঙ্কুর-হেন গতিমান্, বৃদ্ধিশীল।
দিবারাত্রি গেঁথে গেঁথে দিয়েছে সে মিল
দুঃখে সুখে আলোয় আঁধারে।
একই আধারে
মিশায়েছে মৃত্যু ও অমৃত।

অপহৃত
শৈশবে জননী তারে কপোলে চিবুকে
চুমা দিল বারম্বার, মুখে
স্নেহধারানিষ্যন্দিত স্তন।
বন্ধু দিল আলিঙ্গন
একদা কৈশোরে।

কিছু ভ্রষ্ট হয় নাই ; মুগ্ধ অণুপরমাণু ভ'রে
এ দেহের, আছে সব।
উষায় সন্ধ্যায় নিত্য আলোঅনুভব ;
শ্যামসুনীলের স্পর্শ ; অনন্ত উৎসব
জলকলকলস্রোতে, বিহঙ্গের গানে,
কভু কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা-মাঝখানে—
আছে সব। দণ্ডপল দিবারাত্রি শরৎ শিশির
যতই বহিয়া গেছে, তীর উপতীর
ভরি দিয়া এ দেহের, জানি,
অন্ধকারে মর্মরিত মূক কানাকানি
রেখে গেছে : শতলক্ষ স্মৃতি, স্বপ্ন, সাধ,
অহেতু আনন্দমূর্চ্ছা, অহেতু বিষাদ।
অবশেষে আজি এই পথে
কান পেতে মুহূর্তগণনা ; দূর ভবিষ্যতে
কার পদধ্বনি বাজে ? সে কি তার চেনা ?

ফুরাবে না কভু ফুরাবে না
এ ঔৎসুক্য এ কৌতুক।
এ কল্পনা সত্য হ'তে পারে ?— হায় রে ভাবুক
দেহ মোর, বীণার তন্ত্রীর মতো
সঙ্গীতঝঙ্কারে তুমি বাজিবে নিয়ত
আকাশে আকাশে কোন্ করস্পর্শ লভি !
সীমা সংজ্ঞা পরিণাম লুপ্ত হবে সবই
কভু কি নিবিড়তম রভসআবেগে !
জড়ত্বের স্বপ্নঘোরে জেগে
নেহারিবে আলো তুমি, প্রাণ তুমি, ঘনিষ্ঠ চেতনা—
মূঢ় ক্ষুদ্র পরিক্ষীণ দেহ না, দেহ না
জন্মজরামরণঅধীন।

ভালোবাসি এ দেহ আমার। একদিন

রহস্যের সীমা
না হ'তেই আলোকমহিমা
এ দৃষ্টিতে নিবে যাবে ; পশিবে না কুসুমসৌরভ
মুগ্ধ ঘ্রাণে, উৎসুক শ্রবণে স্বর। ধুক্‌ ধুক্‌ রব
হৃদয়ের থেমে গিয়ে ধমনীধাবিত রক্তধারা
স্তব্ধ হবে। সেই ক্ষণে আত্মবন্ধু যারা
বিলাপ না করে যেন অশ্রু ভরি নয়নে নয়নে।
প্রিয়া যেন পুষ্প আর পল্লব -শয়নে
শোওয়াইয়া অবশেষ জীবনউত্তাপ
চুম্বনে মুছিয়া নেয় ওষ্ঠাধর হতে : পুণ্য পাপ
পাবনীজাহ্নবীস্রোতে ধুয়ে
চিতার উপরে থুয়ে
বেড়ি দেয় প্রোজ্জ্বল হুতাশে।

ক্ষিতি হয়ে তেজ হয়ে বাষ্প আর বায়ুর উচ্ছ্বাসে
এ দেহের পরিণাম ধূলি হতে ধ্রুবতারাববি।
সে দিন এ যদি
কোনো সন্ধ্যাশোভা হয়ে জাগে
প্রতীচীগগনপটে, কোনো প্রেমিকের পূর্বরাগে
হয় কোনো অভূতভাবনা,
যাত্রীজনচরণে জড়ায়, জানিব না
আমি জানিব না, দেহ -বিচ্ছিন্ন, উদাসী।

আমার এ দেহ ভালোবাসি।

শান্তিনিকেতন
২৮ বৈশাখ ১৩৪৫

বৈশাখী পূর্ণিমা

আস্খলিত-স্বপ্নের-অঞ্চল হেরো বৈশাখীপূর্ণিমা
বিরাজিছে সুপ্ত দিগ্‌বিদিকে : যেথা প্রান্তরের সীমা

তালতরুশ্রেণীস্তব্ধ ; অরণ্যে উঠিছে ঝিল্লিস্বর ;
জনশূন্য সৌধছাদ ; খোয়াইএর বালুকাকঙ্কর-
প্রবাহিণী-নির্ঝরিণী-স্রোতে চঞ্চল সফরী স্থির ;
নবপ্রাণসঞ্জীবিত পথতৃণে শোভিছে শিশির
আনন্দাশ্রুজল।

বিকশিত কামিনী-কুটজ ফুলে
মদির সৌরভ জড়ায় পল্লবজাল : ঢুলে ঢুলে
পড়িছে পবন ত্রিযামাযামিনীশেষে। বহুদূর
বৃক্ষশাখে বিহঙ্গের কাতর মিনতিপূর্ণ স্বর
বলে, বউ, কথা কও : পক্ষপুটে অসিতধূসর
কণ্ঠদেশে চন্দ্রের চন্দ্রিকা।

অস্তঅচলশিখর
উত্তরিয়া স্বপ্নের দেবতা ফিরে চায় : জাগে ধীরে
উষা, জাগে মৃদুমন্দ গুঞ্জরণ লোকালয়তীরে।

শান্তিনিকেতন
১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

সুনন্দাকে

কুটজগুচ্ছ ছিল না তোমার কালো চুলে,
আদর করিয়া কবরীতে আমি দেছি তুলে—
কখন জানো কি সই ?
সত্য তোমায় কই,
চয়ন করি নি কাননের ফুল অঙ্গুলে,
পরশ করি নি তব কুঞ্চিত কালো চুলে।

অঙ্গে তোমার পরায়েছি বাস শিখাসম,
মোর উপহারে সাজায়েছি তনু অনুপম—

কখন জানো কি সই ?
সত্য তোমায় কই,
সুনিভৃত তনু পরশ করি নি করে মম,
অপার্থিব এ বসনভূষণ শিখাসম।

আদিম প্রভাতে কমলারে ঘেরি নন্দিয়া
সৃষ্টিসিন্ধু নেচেছিল যথা অয়ি প্রিয়া,
আজি তব চৌদিকে
সুমোহন মায়া লিখে
কল্পনালীলা মেলিল আকুল কবি-হিয়া—
আদিমসিন্ধু-সমান পুলকে নন্দিয়া।

কূটজগুচ্ছ ছিল না তোমার কালো চুলে

বোলপুর
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

সুনন্দা

আনন্দউতল
বসন্তলগনে ছিল ধূপছায়াময় বনতল।
তোমারে হেরিনু সখী, প্রথম সেদিন
চঞ্চলা কিশোরী, কায়াহীন
মায়ার মতন : রক্তোপান্ত
কনকবসনপ্রান্ত
ধূলিবিলুণ্ঠিত কভু, প্রতিপদে দোলে
বেণীঅগ্রভাগে ফুল্ল সোনাল-স্তবক, গীত ব'লে
মনে হয় কলকণ্ঠে হাস্য উচ্চকিত।
মুহূর্তেই হলে অন্তর্হিত
হায় যদি অনিমেষ নয়নে ছলিয়া
মনে হয়েছিল মায়া-হরিণী বলিয়া

তোমায় চপলে—
রসাল-শালের বনতলে
নিয়তচঞ্চল আলো-ছায়ার রচনা।
কে করে গণনা
সে কাননে
ষড়্‌ঋতু কতবার এসে ফিরে গেছে! অন্যমনে
চলেছিনু, তাই
খুঁজি নাই
অবলুপ্ত পদচিহ্নগুলি।
সে পথের ধূলি
তৃণে পর্ণে সমাচ্ছন্নপ্রায়
উপশান্ত আজি কাল-বৈশাখী সন্ধ্যায়।

কানন-বাহিরে এসে হেরি অকস্মাৎ
চলেছ বন্ধুর সাথ,
হে সুন্দরী বধূ, মৃদু মন্থর চরণে
সিক্ত ধূসর সরণে
স্থিররূপবর্তিকায় দীপ্তি সঞ্চারিয়া
প্রতি পদে: সর্ব অঙ্গ বেষ্টিয়া বেড়িয়া
নীলাম্বরী বাসখানি ঢাকে নাই সব

দূর হতে হল অনুভব
কী হাসিটি লগ্ন তব নয়নে অধরে,
কী সুষমা অলক্ষিত পারিজাতথরে
বিকশিত ললাটে কপোলে,
ধুক্ ধুক্ হৃদিচ্ছন্দে দোলে
কী আনন্দ!
ধীরপদে গেলে চলি সিক্ত কী সুগন্ধ
সঁপি সমীরণে!
কবরীতে শোভে সংগোপনে

সোহাগসুরভি বুঝি একগাছি বকুলের মালা!
তারই বাস, তাহারই নিশ্বাস এই বালা!

শান্তিনিকেতন
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

সাঁওতাল মেয়ে

নিকষপাষাণে গড়া প্রতিমা ও মেয়ে,
সাঁওতাল মেয়ে,
চলেছে গেরুয়া-রঙ রাজপথ বেয়ে
কোন্ রুক্ষ উদাস ডাঙায়
দু-একটি আম-জাম-পাকুড়ের ছায়
সুখশান্ত গ্রামে কোন্ মাটির কুটিরে—
মনে তাই তোলাপাড়া করি ফিরে ফিরে।

ছাপায়ে উঠিতে চায় লাবণ্য কি শ্যাম দেহসীমা!
চলনভঙ্গিমা
রাজকন্যা রাজেন্দ্রাণী -হেন
রূপকথাকল্পলোকে বাস যার জেনো
মনের গোপনে,
কোনো রাজা-রাজড়ার প্রাসাদভবনে
হয়তো যে নাই।

বিস্ময়ে দু চোখ ভ'রে চাই।
ঋজুগ্রীবা-
লগ্ন হয়ে শোভা পায় কিবা
দুগাছি পুঁতির হার, পীত, শুভ্র, সিঁদুরবরণ।
যেমনি ওঠে বা পড়ে সলীল চরণ
ওঠে দুলে দুলে
কুণ্ডলিত ঘন কালো চুলে

ফুল্ল সোনালের ফুলে খণ্ড খণ্ড রোদ।

আচম্‌কা মোর
হৃদয়ের চারিধার করেছে আমোদ
চলার বাতাস লেগে ওর।

ভাবি তাই,
চৈত্রপূর্ণিমার রাতে বন্ধু আসে নাই
কুটির-দুয়ারে ওর ?
অতনু দেবতা হেসে প্রণয়ের ডোর
রোমাঞ্চিত দুটি প্রাণে বাঁধে নি কি তবে
বীজ বুনিবার ক্ষণে, পৌষালী পরবে.
ওপার-পল্লীর কোনো বাঁশরির রবে ?
বাঁধে নি কি তবে ?

গোধূলির লগ্নে কবে এসেছিল বর
দরিদ্র বাপের ঘর
আনন্দে উৎসবে ভরি দিয়া ?
শাল-মহুলের শাখা সাক্ষী করি সুলজ্জিত হিয়া
ঘামে-ভেজা হাতখানি রেখেছিল হাতে ?
আলোকিত মুখরিত উৎসবের রাতে
জননীর হাতে বোনা শোভন বসনে
সেজেছিল— কিশোরীর প্রাণের গোপনে
অচেনা সুরভিশ্বাস শাল-মহুলের-গন্ধ-সাথে
ঝরেছিল উৎসবের রাতে ?

বৎসরান্তে রথের মেলায়
সাশ্রু-মেঘে-ছায়া-করা বিকাল বেলায়
মদমত্ত পুরুষের দল
বাজায় মাদল

যবে আবেগে উল্লাসে,
তরুণীরা নাচে আর দিবাস্বপ্নঘোরে মৃদু হাসে
লোল কটি পরস্পর বাঁধি বাহুপাশে :
সব মিলে যেন কোন্ সুদূর সাগরে
একটি কাজল ঢেউ ওঠে আর পড়ে
সুখালসসুললিত তানে।
সে তরঙ্গ-মাঝখানে
দুলেছিল নাচে ?

শ্রাবণের মেঘমালা যবে ঘেরিয়াছে
ঐ নীল মোহে নীল গিরিশির
গৃহকাজে ফেরে তবু চিত্তে তরুণীর
গুঞ্জরি ফেরে কি হায় অবোধ আবেগ :
পূবে গুরু গরজায় মেঘ,
অজয়-নদীতে বান পড়ে,
দু নয়নে জল ঝরে
আজ মনে মনে !

সজল'জলদ'কান্তি। শরতের শুভ্র মেঘ-সনে
উপমা জাগায় অতি
লঘু তার গতি।
কখন সে গতিবেগে রাজপথ বেয়ে
ভেসে চলে গেল এক সাঁওতাল মেয়ে।

শান্তিনিকেতন
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

* সাঁওতালি গানে আছে—
পূবের দিগে মেঘ ডাকে,
নদীতে বান পড়ে,
চোখেরই জল ঝরে মনে মনে।

বর

শুক্লনবমীর চাঁদ কাননের শিরে
খসিয়া পড়িছে ধীরে ধীরে।
অচঞ্চল স্থির
অমাবস্যাঘন দীঘিনীর।
শাখাঅন্তরালে পশি সুদীর্ঘ চন্দ্রিকা
কষিতকাঞ্চনলিখা
নিকষে তাহার দিল আঁকি।
কুলায়ে নিদ্রিত পাখি।
কভু পেচকের অর্ধ-স্বগত কাকুতি
শব্দহারা রহস্যের রোমাঞ্চবিবশ অনুভূতি
রহস্যে ঘনায় আরও অন্তরে অন্তরে।

এই ক্ষণ। শত জন্ম শত যুগ পরে
এ জীবনে এল বুঝি আজ।
মিথ্যা এই লাজ
কেন বধূ—
এ দ্বিধা প্রেমের নিবিড় নিঃসীমতম মধু
সম্মিলিত-তনুমন-সম্পুটে ভরিতে,
অকপট মহানন্দে অকুণ্ঠিতচিতে
ভুঞ্জাতে ভুঞ্জিতে ?
এ সঙ্কোচ কেন ?

তুমি দেখা দাও নাই যতক্ষণ
নিরবধি কাল আর নির্বাধ ভুবন
গোপন করিয়া ছিল নিজ অর্থসীমা।
প্রভাতের আলোকমহিমা
আলোকে যে হয় নি প্রকাশ।
রাত্রি এসে করেছে নিরাশ—

গ্রাস না করিয়া নিজ অতল অকূল
স্পর্শপারাবারে, শুধু স্রোতে-ভাসা নক্ষত্রের ফুল
ব্যর্থ উপহার আনিয়াছে শত শত।
তুমি দেখা দাও নাই, এ প্রাণ নিয়ত
স্বপ্নভ্রমরের মতো আকাশকুসুমে
অহেতু ফিরেছে চুমে চুমে।
দশ দিকে শ্যাম সোনা নীল
শান্তি তারে দেয় নাই বুঝি এক তিল।
হায় সে-সবারই পানে দু বাহু বাড়ায়ে
নীরবে কেঁদেছে প্রাণ, এ দৃষ্টিতে এ দৃষ্টি ছাড়ায়ে
যেথায় যাকিছু আছে : প্রান্তর, পর্বত, অগণন
বন উপবন,
নদ নদী।
কেঁদেছে সে নিরবধি
'অজ্ঞাতসুদূর ! মোরে লও তুমি লও তুমি' ব'লে।

সে কান্না শুনেছ তবে ? এলে তাই চলে
বিজন এ জীবনের পথে
শ্যাম সোনা নীল হতে
বিশ্বভুবনের, রমণীয় রমণীমূরতি ধ'রে।
সীমাশূন্য চিত্তাকাশ, ওরে,
অপরূপ স্থির দুটি নয়নে তোমার
প্রভাতের আলোবন্যা রাত্রির আঁধার
একসাথে উচ্ছলিছে এ কোন্ কৌতুকে !
মুগ্ধ মম নয়নসম্মুখে
ধরিত্রী কি মূর্তিমতী আজ
নতোন্নত অঙ্গে তব করিছে বিরাজ !

এলে যদি, আবার যেয়ো না চ'লে
ছলিয়া আমায়। মিলাব মিশাব ব'লে

হৃদয়ে হৃদয়
দেহ আর সত্তা সমুদয়
সীমাহীন সাগরে তোমার,
ডুবে যাব, ভেসে যাব, আর
ফিরে আসিব না এই কূলে—
এ হৃদয় এ দেহ আকুলে
তাই বঁধু, তাই।

সে আহ্বান তুমি শোনো নাই ?.
হৃদয়েতে কান পেতে তুমি শোনো নাই ?
ওগো বিশ্বভুবনের মূর্তিমতী মায়া !
ওগো কায়া ! আলোকের কায়া !
মৃত্যুউৎসমুখে চির-উৎসার চেতনা !
আনন্দের অরবিন্দ ! এ দেহ দেহ না।
মুদ্রিতনয়ন মরি এই তব মুখ
সম্পূর্ণ অঞ্জলি ভরিয়াছে এই তব বুক
সৃজনের অনাদ্যন্ত রহস্যে সকল !
ভরিয়া দিয়েছে করতল !
অমৃতের বৃষ্টি এ যে অঙ্গুলিপরশ !
দুঃসহহরষ,
ওগো, তব প্রথম চুম্বনে
সৃজিল যে নবতন স্বর্লোকঅঙ্গনে
সুরসভা সঙ্গীতউৎসবী—
ধ্রুবদৃষ্টি মেলি হাসে স্রষ্টা আদিকবি
স্তব্ধস্রোত বুঝি কাল-স্রোতস্বতী-পারে !

ওগো, লও-না আমারে
একান্তই নগ্ন দেহে, নগ্ন প্রাণে, নিমগন হয়ে
নিঃসীম প্রণয়ে।

১১ জ্যৈষ্ঠ

বধূ

লহো লহো !
কী জানি এ কী মাধুরী, সখা, হয়েছে দুঃসহ ।

লহো তুমি লহো ।··· ওগো বিমুগ্ধ ভ্রমর,
ভেবেছ কি নিষ্করুণ নিরুদ্ধ অন্তর
আপনি ভুঞ্জিতে চায় আপনার মধু ?
গীত গুঞ্জরিয়া হেন ভিক্ষা করো, বঁধু,
ফিরে ফিরে তাই ?
তুমি জানো নাই
পুলকিত প্রস্ফুটিত প্রসূনের সম
নতবৃন্ত সর্বসত্তা মম
রাগরক্ত এ দেহের দল-শত দিয়া
তোমারে ঢাকিয়া
রুদ্ধশ্বাস আত্মনিবেদনে
নিমেষেই সব মধু সব গন্ধধনে
বিনিঃশেষে নিঃস্ব হতে চায় !
জানো নাই হায় ?

ওগো বন্ধু, কৈশোরের সীমায় যে দিনই
সহসা জেগেছে মম যৌবনযোগিনী
একতারা হাতে,
জেনেছে সে অন্তহীন বিচ্ছেদের রাতে
চিরবিরহিণী ।
জেনেছে যে যৌবনযোগিনী ।
একক তন্ত্রীতে মৃদু গুণ্ গুণ্ গীতে
ফুটায়েছে তারা তাই শূন্যে শূন্যে তমিস্রনিশীথে
সুপ্তিহীন, সুখহীন ।

বন্ধু, তুমি এলে গো যেদিন
পূর্বাশায় উদ্ভাসিলে প্রথম প্রভাত।
তব জ্যোতির্ময় অঙ্গে লীনতনু, নাথ,
অপরূপা আমি যে উষসী।
কী আলোক উঠে গো উলসি
আমার জীবনে আজি আমার জগতে
শততারসুগ্রথিত বীণাযন্ত্র হতে
তব হাতে
আজি এ প্রভাতে!
কী আলোক উলসিত তুমি তাই জানিতে গো যদি!

লহো তুমি, আত্মা হতে এ দেহ- অবধি
দু বাহু -বন্ধনে লহো সব।

আজি যেন হয় অনুভব
শ্রাবণের মেঘসম
অঙ্গে অঙ্গে মম
রসভারাতুর হয়ে নেমেছে হৃদয়।
কে বলে রে জড় দেহ? আজ মনে হয়
আলোকের অমৃতের পারে
মূর্ছে বারে বারে
প্রতি অণু পরমাণু গানে আর গানে।
অসীম কী রহস্য কে জানে
এ দেহের মাঝখানে!

কে দেবতা চিরমৌন স্থির
জাগিয়া রয়েছে সেথা নূতন সৃষ্টির
কোন্ মহাধ্যানে,
পুণ্যময় প্রাণময় দেহ-মাঝখানে!

লহো লজ্জা, লহো ভয়।
লহো, বন্ধু, হৃদয়ে হৃদয়।
এ বসন এ ভূষণ
লবে লও, বিরহদূষণ
দূর করো এই কণ্ঠহার।
তোমার আমার
মাঝে কোনো ভেদ নাহি থাক্।
নির্বাক্, নির্বাক্
এক দেহ এক প্রাণ একই হৃদয়
যেন জেগে রয়
নিখিলবিলুপ্ত এক অনন্ত নিমেষে।

পারহীন সমুদ্রের পারে যেন এসে
দাঁড়ালেম তুমি আর আমি।
লুপ্ত দিবাযামী।
অন্তহীন সুদূর কি ডাকে
তোমাকে আমাকে ?
এক সাথে ঝাঁপ দিব।··· তবু কেন ভয় ?
কেন মনে হয়
উত্তরঙ্গতনু এই ভাসান-খেলায়
যদি অবসাদ আসে, বিষাদে হেলায়
মুখ ফিরাইয়া লও যদি কোনোদিন !
দেহ মন আত্মা যদি হয় ভিন্ ভিন্—
কামনা ও প্রীতি !
যদি গো বিস্মৃতি
কুহেলিকাআবরণে
আবরে আলোকময় ভাস্বর জীবনে !
মিথ্যা কেন এ সংশয় এই দ্বিধা আসে।

এই লও আলিঙ্গন। লও চুমা। লও বাহুপাশে
ওগো তুমি, ওগো আমি, বিনিঃশেষ তব প্রেয়সীরে
জন্মমৃত্যু দুঃখসুখ স্বর্গমর্ত ঘিরে—
সুনিবিড় সম্পূর্ণ আশ্লেষে
লও তুমি, লও ভালোবেসে।

শান্তিনিকেতন
১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

প্রতীক্ষা

তোমারই কারণে আছি জেগে।
পূরব-পবন-বেগে
কদম'কেশররাজি ঝরে
আজি এ বাদলদিনে
শ্যামলিম তৃণে তৃণে
সিক্তসরণীহৃদি-'পরে।

কোমল'কনককরে
কাজল'জলদসীমা চুমি
ধীরে ধীরে উঠে গো কুসুমি
প্রভাত'তপন।
তোমারই কি সুদূর স্বপন
খনে খনে ভেসে আসে ওই—
নাচিছে তাথিয়া থৈ
হেথা হোথা কুটজের ডালে
উলসিত তালে তালে
নবনীশুভ্র ফুলগুলি।
কমনীয় নীলিমায় ওঠে দুলি দুলি
নববেণুপল্লবরাজি।
স্নিগ্ধ কাননে শুন আজি

পাপিয়ার স্বর
মিলনাশামুখরিত। মালতীমুকুলে মধুকর
নিমগ্নপ্রাণ
পাশরিল গুঞ্জনগান।

তোমারই কারণে আছি জেগে।
পূবান পবনবেগে
পুলকিত প্রতি তরুতল
করে চঞ্চল
আভাসে-উদিত ছায়া আলো :
মিলালো মিলালো
মন্থরমেঘময় স্নিগ্ধ ধূসরে
ক্ষণকাল-পরে।

জাহ্নবীজলে দেহ ধুয়ে
বিজন এ বনভুঁয়ে
এসো তবে এসো তুমি আজি
করে লয়ে কুসুমের সাজি,
সিক্ত উজল এলো কেশ,
পূজারিনী-বেশ।

এ জনমে এই তো প্রথম
দেখা— হায়, মনে একি ভ্রম,
চিরদিন যেন, বধূ, তোরে
জেনেছি চিনেছি ওরে—
চিরযুগ বিমুদিত নয়নে রয়েছ তুমি লেগে।

তোমারই কারণে আছি জেগে।

শান্তিনিকেতন
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

এষা

তোমা লাগি করি নাই তপ, করি নাই হৃদয়ের সমুদ্রমন্থন।
অতল তমিস্র হতে আলোককমলে বিরাজিতা লক্ষ্মীর মতন
হও নি উদয়
হে কল্যাণী, ধূলিশায়ী মোর এ জীবনে : ওষ্ঠাধর সুধাহাস্যময় ;
নয়নে পুলকলজ্জা ; তৃতীয়ার শশীর মতন ললাটফলকে
স্নিগ্ধ শান্তি অলকাবলিত ; তারকাপ্রসূনস্ফুট কুঞ্চিত অলকে
অন্ধকার, মৃত্যু, মোহ ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরিবার অতল অকূলে ;
অঙ্গে অঙ্গে সৃজনলীলার অপরূপ ছন্দ, সুর ; শ্রীচরণমূলে
মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গভঙ্গিম কালধারা, আর এই বিমুগ্ধ হৃদয়।

হে কল্যাণী, ধূলিলুণ্ঠ কুণ্ঠিত জীবনে নহে নহে তব অভ্যুদয়।

ত্রিলোকঈশ্বর শিব দিগ্বসন শ্মশানে মশানে ধেয়ায় তোমারে।
তোমারই বিচ্ছেদবিষ কণ্ঠে ধরে, মিলনের সুধা চন্দ্রমাআধারে।
আনন্দবন্দনমন্ত্রে কল্লোলিত জটায় জটায় সুরধুনীধারা।
আরত্রিকদীপদীপ্তি ফণায় ফণায়। তাণ্ডবিত নৃত্য আত্মহারা
অনন্ত আবেগে অনুক্ষণ। যুগসন্ধ্যাসমাগমে সেই একদিন
চতুর্দশ ভুবনের পথে পথে সম্মোহিত দেব দীন উদাসীন
ফিরিলেন প্রাণহীন শব বহি তব। অতিদীর্ঘ বিচ্ছেদঅমায়
মুদ্রিত নয়নত্রয়, নির্বাপিত ললাটহুতাশ, গ্রস্ত চন্দ্রমায়
সুধাহীন দেবলোক, তুষারসম্পাতে জড়ীভূতা সুরতরঙ্গিণী
অযত্নশিথিল জটাজূটে। প্রলয়মগন শিব সৃজনসঙ্গিনী
সতীর বিরহে।

তপোরিক্ত এ জীবনে এ ধূলায় তব আবির্ভাব কভু নহে নহে।

তৃষিত এ প্রাণ শুধু বিছায়েছি নক্ষত্রের তলে অসীম আকাশে
অলীক কী কল্পনায়! হয়তো বা ঝাউবনানীর কোনো দীর্ঘশ্বাসে

তন্দ্রাহারা হৃদিতলে জন্মান্তর-ব্যথা ছুঁয়ে গেছে ব্যাকুল করিয়া।
কখনো বিস্মৃতমুখোপরে স্বপ্নের গুণ্ঠন হেরি গিয়াছে ঝরিয়া
অশ্রুবিন্দু নিঃসঙ্গ শিথানে। জানি আমি প্রতিদিন এ মোর জীবনে
শ্যামল সুনীল শোভা শূন্যে জলে স্থলে, দু সন্ধ্যার কিরণদীপনে
নিত্যনবারুণরাগ, বিহঙ্গকাকলি, শৈশবের কৈশোরের মুখ,
চূতবকুলের গন্ধ, বীণাধ্বনি, পথলেখাখানি দিগন্তউৎসুক,
অপরিচিতের গমনের ভঙ্গীটুকু কণ্ঠটুকু নামটুকু শুধু
তোমারই উদ্দেশে অর্ঘ্য গূঢ়মর্মে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে বঁধু—
বোবা ওষ্ঠাধর স্ফুরে, নাম ধ'রে ডাকিতে তোমায় করিছে আকৃতি।

তোমা লাগি করি নাই তপ ; তুষ্ট আছি লয়ে তুচ্ছ স্বপ্নঅনুভূতি।

স্বর্গনির্বাসিত মোর এইভাবে মানবজন্মের চলে যায় দিন।
কালবৈশাখীর লগ্নে ধূলিময় ঘূর্ণঝঞ্ঝাবেগে শূন্যেই বিলীন
প্রবঞ্চিত জীবনের লক্ষশত দুঃখ আর সুখ, স্বপ্ন ও সাধনা।
বক্ষে তৃষা ; চক্ষে তৃষা ; দিগ্‌বিদিকে মরুমরীচিকা, মায়ার কাঁদনা।
একদা মরণ শূন্য অবসন্ন যাত্রীজীবনের দীর্ঘপথশেষে।...
কিন্তু, যদি জন্মান্তরদয়িতের গূঢ় আকর্ষণে দেখা দাও এসে
সহসা এ ধূলিপথে কোনোদিন আমারই মতন, মানবনন্দিনী,
দুঃখসুখ-আশাশঙ্কা-বেদনার বিচিত্র বন্ধনে একান্ত বন্দিনী,
সুচিরপ্রচ্ছন্নতপঃপুণ্যফলে তবুও নয়ানে বয়ানে চন্দ্রিকা,
মন্দারকুসুমনিন্দী তবু গূঢ় মর্মে অনির্বাণ বজ্রানলশিখা,
মরিবার আগে—
নির্বাক্‌বিস্ময়ভরে নেহারিব : এই মুখখানি প্রাণঅনুরাগে
বিরচিয়া বিধাতা কি এবে মোর প্রাণের বাহিরে করিল বিবাগি !

প্রাণে তবু ধরিব না প্রিয়া ! এ জন্মে যে কোনো তপ নাই তোমা লাগি।

শান্তিনিকেতন
২৭ বৈশাখ ১৩৪৫

আত্মঘাত

আত্মহত্যা করিলাম। সুস্বাদ বিস্বাদ
সব-কিছু চেখে দেখে এতদিনে মিটিয়াছে সাধ
মর্তজীবনের। এ কি ঘূর্ণতাণ্ডবিনী
ভৈরবীর রাত্রিদিনই
উন্মত্ত আবেগ ? তাও নয় ?
মহাশূন্যময়
অলক্ষ্য কালের চক্র-আবর্তনে অহর্নিশ ঘুরে
অগণিত চক্রপুঞ্জ আর্তনাদে পূরে
এ বিশ্বের আদি অন্তে
দন্তে-দন্তে-বাঁধা ?
অন্তরে বাহিরে
যান্ত্রিক অভ্যাসে ফিরে ফিরে
আসে সেই পুরাতন—
সেই সূর্য, সেই তারা, দুঃখসুখ, অক্লান্ত যতন
মায়াময় মরীচিকা-তরে,
অবশেষে শূন্যতার বোধ, অবোধ অন্তরে—
স্বর্গআশা, নরকের ভয়,
মৃত্যু, পরাজয়,
পরমা বিস্মৃতি।

কবি কিম্বা কবিবর, কী গাও উদ্‌গীতি
নূতনের ? সেই পুরাতন আসে সেজে
চিরনূতনের বেশে। সৃষ্টির মর্মে যে
প্রাণ নাই, প্রেম নাই, কোনো বোধ নাই।
ক্লান্তি তাই
তোমার আমার অনাহূত আগন্তুক প্রাণে,
এখানে সেখানে
জীর্ণতার দীর্ণতার দাগ,

বিচ্ছেদ বিরাগ,
মূর্ছা। তোমার আমার কোনো
চিহ্নলেশ থাকে না কখনো
জলে স্থলে অনলে অনিলে
নির্বিকার শিলাপটে সুদূর সুনীলে—
মিলনের বিচ্ছেদের বিষাদের গান
নহিলে তো নিশিদিনমান
সূর্য শশী তারাই গাহিত ; তাহাদের হয়ে
তুমি গান রচিতে না।

এ যন্ত্রআলয়ে
সকলই যান্ত্রিক যদি, জন্মজরা,
ক্ষুৎপিপাসা, ইন্দ্রিয়আবেগ, বাঁচা-মরা,
বাস্তবিক বহু বিড়ম্বনা
অকথ্য উল্লেখ করিব না—
এমন-কি প্রেম ও বাসনা,
ক্ষণআশা আর দীর্ঘ নৈরাশ্যবেদনা,
অবোধ উৎসুক
হৃদয়ের সূক্ষ্মতম দুঃখ আর সুখ,
সকলই যান্ত্রিক যদি,
নিরবধি
কেন এই ভান—
'স্বসমুখ স্বতঃস্ফূর্ত' জীবনের মিছে জয়গান ?
নিষ্করুণ প্রখর আলোকে
বিজ্ঞানের, হেরিলাম মোহমুক্ত চোখে
বাস্তবের দৃঢ়ভূমি বন্ধুর রক্তাক্ত পদতলে—
কারও অশ্রুজলে
ভিজিবে না সেই নির্বিকার।
কিম্বা, আপেক্ষিক সত্তা তার
চতুর্মুখ আয়তনে

আত্মঘাত

অতর্ক্য অরূপ— মূর্তিমোহমুগ্ধ মনে
হেন শূন্য পরিহাস হানে,
প্রাণের এখানে
একান্ত প্রবাস। গৃহ কোথা? গৃহ কোথা তবে?

বিজ্ঞানে দর্শনে কেন টানি? স্বতঃসিদ্ধ অনুভবে
জানি আমি, এই
জীবনে যে কোনো মুক্তি নেই—
সব দিকে সীমা শুধু সীমা।
বনের সবুজ ওই অম্বরনীলিমা
দৃষ্টিঅবরোধকর।
দৃষ্টি সেই নির্বোধ ভ্রমর
সুন্দরীর স্মিতমুখমুদিতকমলে
উড়ে উড়ে বৃথাই যে সাধে শত ছলে
প্রবেশপিয়াসে। শ্রুতি পায় নাই টের
অবচন প্রেমীহৃদয়ের
অন্তর্গূঢ় রহস্যবারতা। মনে হয়
এ বিশ্বের পুষ্প পাখি রূপ সমুদয়
শশী তারা সুহৃদ্ স্বজন সবই ধ্বনিময়—
ধ্বনি শুধু; তারই ঐকতান
শ্রুতিমূলে-সমুৎসুক প্রাণ
কভু শুনে নাই।
স্পর্শে বা আঘ্রাণে নাহি পাই
মুক্তিসুখে উড়িবার অসীম আকাশ।
নয়নে নয়ন মিলে যে মিলনে নিশ্বাসে নিশ্বাস,
অঙ্গে অঙ্গে আসঙ্গের সর্বনাশী ক্ষুধা সব করে গ্রাস,
হায় তারও রভসসুখের অবসাদে
স্বপ্নে প্রাণ স্মরে যে বিষাদে
বুঝি এক পলকের তরে
মেলে নি, মেশে নি তারা, সুধাময় নাস্তিত্বসাগরে

এক বিন্দু বারি স্পর্শ করা কূল থেকে।

অস্তিত্বে কে
সুখ লভিয়াছে কবে?
জ্ঞানে— প্রেমে— ইন্দ্রিয়ানুভবে
সীমা হায়, সীমা, শুধু সীমা!
অলৌকিক ত্রিদিবের অলীক মহিমা
মূঢ়মনোহর শুধু। অহেতুক নরকের ভয়।
আশা শঙ্কা বিসর্জি উভয়
খুঁজি সেই চিরন্তন মৃত্যুঅন্ধকার
ক্ষণদ্যুতি জীবজন্মমরীচিকা যার
আদি অন্ত জানে না রে।
মগ্ন হলে সেই মৃত্যু- প্রান্তরে পাথারে
সুখদুঃখ আশানিরাশার
দ্বন্দ্বশেষ চেতনার সাথে,
নিত্য প্রভাতে প্রভাতে
জাগিবার এ বিড়ম্বনার অবসান।

অথবা নির্বাণ
পূর্ণতার পূর্ণ আস্বাদন? সীমালুপ্ত এ সত্তা কেবল
লবণসমুদ্রে যেন লবণপুত্তল
মিলে যাবে মিশে যাবে চিরমর্ত্তলোকে
যেখানে যে কেহ আছে সকলেরই সুখে আর শোকে,
এ বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত তার
পৃথক বিষাদহর্ষ আর
থাকবে না!

তবে যদি অবাঞ্ছিত অহেতুক জীবনের দেনা
এক জন্মে না'ই শোধ হয়,
কর্মসূত্রে বাঁধা কর্মময়

আত্মঘাত

ফিরে আসি সংসারআলয়ে
দেহ ল'য়ে মন ল'য়ে
বারম্বার—
মুক্তি কোথা মুক্তি কোথা তার
বন্ধনপীড়িত যেই প্রাণ,
অপ্রতর্ক্য হে অদৃষ্ট!
প্রমাণঅসিদ্ধ ভগবান!

ঝাঁঝা
৬ পৌষ ১৩৪৫

আত্মঘাতী

আত্মহত্যা করিলাম।
অভ্যাসশৃঙ্খলবদ্ধ অস্তিত্বের কোনো অর্থ নাই।
অদৃশ্য কালের চক্রআবর্তনে ঘোরে এ বিশ্বের
আদি-অন্তে-দন্তে-দন্তে-বাঁধা অগণিত চক্রপুঞ্জ,
ফিরে ফিরে নূতনের ছলে আনে চিরপুরাতনে
ক্ষণজীবী নরের ক্ষণিকতম মোহের আবেশে।
সেই সূর্য, সেই শশী, দিবারাত্র, ঋতুর পর্যায়,
জন্মমৃত্যু, লাভক্ষতি, হৃদয়ের দ্বন্দ্বআন্দোলনে
সুখদুঃখ আশাশঙ্কা প্রণয়বিরাগ— অবশেষে
নৈরাশ্যবিষাদ আর ব্যর্থতার বোধ জীবনের
কিম্বা নিরর্থক স্বর্গনরককল্পনা— মরুভূমে
বালুঝঞ্ঝাবিব্রত পক্ষীর ন্যায় মূঢ় অভিনয়
অন্ধতার।

অনাহূত আগন্তুক প্রাণ ও চেতনা
আকস্মিক— নিশ্চেতন ভুবনের মৈত্রী বা করুণা
কোথা পাবে? নিম্নগামী জড়ের এ প্রপাতপতনে
উন্মার্গউন্মুখ ক্ষুদ্র জীবকণা যুঝে কতক্ষণ

কোথা যাবে ? সে তো জড় নয়। তাই অবসাদ, ক্লান্তি,
ক্রমে শত জীর্ণতার দীর্ণতার দাগ, পরিণামে
মৃত্যুমূর্ছা।

মৃত্যু যদি জীবনের ধ্রুব পরিণাম
তবে ব্যর্থ বিড়ম্বনা সুদীর্ঘ করিয়া কিবা লাভ ?
যদি ক্ষীণ ক্ষণআলিঙ্গনে শূন্যমাত্র ভাগ করি
জেগে থাকে জীবনের রঙিন বুদ্‌বুদ, এখনি সে
ফেটে যাক। বিশ্ব হোক নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা— ধিক্,
মতিমান্ নর, তারও যদি বাসনাবেদনা সব
সূক্ষ্মতম ভাবঅনুভূতি যান্ত্রিক, যান্ত্রিক, তবে
এ যন্ত্রণা সহ্য নাহি হয়।

সীমা যে সহে না প্রতি
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে। জ্ঞানে সীমা, কর্মে সীমা, ইন্দ্রিয়ের
অনুভবে সীমা, হায়, ব্যক্তিত্বের সীমা নিদারুণ।
প্রতিবন্ধী নভোনীল, বনের সবুজ। প্রেয়সীর
স্মিতমুখমুদিতপদ্মেও নিষ্প্রবেশ উড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে মরে দর্শ স্পর্শ আস্বাদ আঘ্রাণ শ্রুতি
প্রবঞ্চিত-প্রলুব্ধ ভ্রমর। আকাঙ্ক্ষিত মিলনের
বাসরশয্যায়, মিশে যবে মধুর মদির তপ্ত
শ্বাসে শ্বাস, অঙ্গে অঙ্গে আসঙ্গের সর্বনাশী ক্ষুধা
সব করে গ্রাস, রভসের সুখঅবসাদস্বপ্নে
তখনি কে করে নি স্মরণ একান্ত বিষাদে : হায়,
মুহূর্তের তরে প্রাণ নিঃশেষে মেশে নি প্রাণান্তরে !
সুধাময় নাস্তিত্বসাগরে কূল থেকে স্পর্শ করা
বিন্দুমাত্র বারি !

অস্তিত্বে কে সুখ লভিয়াছে কবে ?
ইন্দ্রিয়ের অনুভবে জ্ঞানে প্রেমে শক্তিতে সত্তায়

আত্মঘাতী

সীমা হায়! সীমা! শুধু সীমা!

তাই আমি আত্মঘাতী।

স্বর্গসুখআশা কিম্বা নরকের ভীতি মনে নাই।
আমি চাই চিরন্তন সেই মৃত্যুঅন্ধকার যার
হেথা সেথা জ্বলিয়া নিভিয়া ক্ষীণায়ু খদ্যোতদল
সৃজিতেছে জীবজন্ম-মরীচিকা, অন্য কিছু নয়।
মগ্ন হলে সেই মৃত্যু- প্রান্তরে পাথারে, সুখদুঃখ-
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব-অবসান চেতনার সাথে,
নিত্য প্রভাতে প্রভাতে জাগিবার এ বিড়ম্বনার
অবসান।

অথবা নির্বাণ হয় যদি পূর্ণতার
পূর্ণ আস্বাদন? ব্যক্তিসীমাঅবলুপ্ত সত্তা যদি,
লবণপুত্তলী যেন লবণসাগরে, মিলে যায়
নিখিল প্রাণীর হর্ষে শোকে? দেশকালপরিব্যাপ্ত
ছন্দের হৃদয়ে চিরতরে হারায় পৃথক্ ছন্দে
হৃদিস্পন্দ? যদি তা হারায়?

কিন্তু, এই অহেতুক
অবাঞ্ছিত জীবনের দেনা, শুধু এক জন্মে যদি
শুধিবার না'ই হয়, দেহ ল'য়ে মন ল'য়ে হেন
কর্মসূত্রে বদ্ধ হ'য়ে ফিরে আসি সংসারআলয়ে
বারম্বার, হায়, তবে মুক্তি কোথা পীড়িত আত্মার
মুক্তি কই—
অপ্রমেয়, অন্ধ, মূক,
বধির ঈশ্বর!

ঝাঁঝা
৬ পৌষ ১৩৪৫

অত্যুক্তি

ঐ মদ' -মুকুলিত চোখ
হরণ করেছে সখী, মোর ভুবনের নিখিল আলোক।
ঝলোমলো টলোমলো তিমিরগহনে
কেন লুকায়েছে ?
ও নয়ন মেলো !
সুধার সাগর সেঁচে
এ জীবনে এনে ফেলো
একসাথে হেমাভহিরণ
নবোদিত রবির কিরণ
আর পূর্ণিমা।
সে আশায় শিহরিছে মোর জীবনের
দূর দিক্‌সীমা
ওগো দিবা, অয়ি পূর্ণিমা !

ঐ মদ' -মুকুলিত আঁখি
ভীরু যেন পাখি
নীল পাখনায়
অরুণিম ঠোঁটে।
ওর গান শোনা যায়,
তাহে ভ'রে ওঠে
বন উপবন
ওরে মনের গহন।
ও নয়ন
মেলো সখী, মেলো—
চকিত ওড়ায় ছেয়ে ফেলো
উৎসুক মোর জীবনের
নীল গগনের
নিখিল হৃদয়

কেন বিজলীঝলকে চলে যাও,
পলকে হারাও,
এই আছ এই নাই এই মনে হয়!
শুধু একবার
হেরো-দেখো কী নীলপাথার—
একবার তারই মাঝখানে
স্থগিত গতির গানে
রহো তুমি রহো!
ওগো অহরহ
এইমতো মিলনবিরহ
লয়ে প্রাণালয়ে এই
অকরুণ খেলা খেলিয়ো না।
হে সখী, পলক ফেলিয়ো না।

ঐ মদ' -মুকুলিত আঁখি
শরমে মুদিবে নাকি
ফুলের মতন
অরুণ অধরে ফুটি
দুটি চুমা পরশিলে পরে?
ভাষাহীন ভালোবাসা
ধায় অগণন
লোভাতুর অধীর অধরে—
পরশিতে,
ওরে হরষিতে,
হৃদিহিন্দোলে হায় রাখি
পুছিতে কারেও সখী, ভালোবাসে নাকি
ঐ মদ' -মুকুলিত আঁখি!

ঝাঁঝা
৮ পৌষ ১৩৪৫

অনঙ্গরেখা

ও তার নয়নের কোণে কোণে
ঝলকায় কথা!
স্ফুরিত অধরদল,
মধুর বিচঞ্চল
পাণি আর পদতল,
মদির-মধুক-ফোটা
সব তনুলতা!
নয়নের কোণে কোণে ঝলকায় কথা!

ও তার কিঙ্কিণীকঙ্কণে
ঘন ঝঙ্কার!
নিমগ্ন ভুঞ্জনে
ভাষা শুধু গুঞ্জনে,
লোল কটি, খনে খনে
হৃদিচূড়ে শিহরণ
সুখশঙ্কার!
কিঙ্কিণীকঙ্কণে একি ঝঙ্কার!

আহা মল্লীমালতী ফুলে
জোছনা ঘুমায়—
হাসিটি অধরকূলে
লগ্ন, আলুল চুলে!
স্বপ্নেরা বুলে বুলে
ক্লান্ত কান্ত তনু
চুমিছে চুমায়!
হেমচম্পকথরে জোছনা ঘুমায়!

২৯ পৌষ ১৩৪৫

বাউল

ও কে বাউল বৈরাগী
অন্তরতলে জাগি
অশ্রুতমৃদু গুঞ্জনে
সদাই আপন-মনে
বাজায় রে একতারা—
কেন গো অশ্রুধারা
সে সুর শুনিতে ভরে দু'নয়ন-কূলে !

আমি তো ছিলেম ভুলে
মধুর ভুবনে শ্যামলে সোনায় নীলে।
দরশ পরশ মিলে
আলয়বিবাগি মোরে
করে যেন কর ধ'রে
নিয়ে গিয়েছিল অচেনা অজানা পথে।
ঊর্মিকাকলি আশ্বিনে নদীস্রোতে,
বিহঙ্গস্বর বসন্তবন হতে,
শত কলরব, কত প্রণয়ের বাণী
ডুবায়েছে কারে জানি
চিরনির্জন নিভৃত হৃদয়তলে।

আজি গো অশ্রুজলে দু নয়ন ওঠে ভরি ;
একতারা তার গুঞ্জরি গুঞ্জরি
হৃদয়ে কে একা জাগি বাউল বৈরাগী
অশ্রুত সুরে গান গায় দিবাযামী :
কেবা আমি ! কে গো আমি !—
অন্তরে একা জাগি বাউল বৈরাগী

শান্তিনিকেতন
২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

উদ্‌বোধন

দেহ, ভালোবাসি তোরে !
সরে যা, সরে যা তবু, আবরণ করে
আর কতকাল রবি এমন করিয়া ?
অন্তহীন ভুবন ভরিয়া
শতলক্ষ দেহ আছে মোর।
বদ্ধ হয়ে তোর
অন্ধ কারাগারে
হারাব সে অধিকার ?— দ্বারে
বিটপী দণ্ডায়মান,
পশু পাখি, দুঃখ আর সুখাতুর প্রাণ
যায় যারা পথ বাহি,
আলো বায়ু,
যাহার সীমানা নাহি
আশ্চর্য সে সুনীল গগন,
দেহ মোর অগণন
দেশে দেশে যুগে যুগে।
একা তুই আবরণ করে
দাঁড়াস না মূঢ় মূক অন্ধ দেহ ওরে
সে-সকল।

ওরে মন,
ছিদ্র-ভরা তরীর সাহসে তোর যখন তখন
পাড়ি দিতে গেছি বারম্বার
অগাধ অপার
সাগরের বুকে।
রুদ্রমূর্তি ঝড়ের সম্মুখে
শঙ্কায় কেঁপেছি কত !
রাত্রিসমাগত

সন্ধ্যাকালে উপুড় করিয়া
ফেলে গেছি উপকূলে।
শান্ত সাগরের বুকে কভু দুলে দুলে
গেছি ভুলে
বিরাটের হৃদয়েতে কী যে ছন্দ—
কী আনন্দ
ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরিবার
অগাধ অপার
পারাবার-হৃদে। ওরে মন,
সময় হয়েছে তার শোন্‌
সাঙ্গ করে যাওয়া
ঘাটে ঘাটে এই খেয়া বাওয়া
অগভীর বেলায় বেলায়।
এ খেলায়
ক্ষান্ত দাও তবে।
ডুবে যাও, ইন্দ্র বায়ু বরুণের আনন্দআহবে
ভয়াল তরঙ্গমালা,
রবিতারাউন্মথন, বাড়বাগ্নিজ্বালা,
যেথা দিবানিশা
গভীর গম্ভীর মন্দ্রে প্লাবে সর্বদিশা—
ডুবে যাও, ডুবে যাও মন।

আবরণ-আভরণ-
নির্মুক্ত আলোকতরবার
ভীমগতি আত্মা খরধার
শতলক্ষ বিশ্ব ধাঁধি উঠুক উলসি—
ভিন্ন হোক সূর্যহৃদি, পড়ে যাক খসি
ছিন্ন নীলাকাশ।
চিরন্তন আনন্দআবাস
হেথা নয়, হেথা নয়, হেথা নয় তার—

অলক্ষ্য আলোকতরবার
উলঙ্গ আত্মার।

শান্তিনিকেতন
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্

নিঃশব্দউদ্‌বেল ঊর্ধ্বে বাষ্পসিন্ধু দোলে।
দলিতঅঞ্জনলিপ্ত দিগ্‌বলয়-কোলে
বনলেখা নয় ও যে বিরহবিধুর
হৃদয়ের দুটি বাহু অদৃশ্য বন্ধুর
সন্ধানে ব্যাকুল।

সেই শ্লোক মনে পড়ে
গীতগোবিন্দের। মেঘমেদুর অম্বরে
অকালে এসেছে সন্ধ্যা। রম্য ব্রজভূমে
গাঢ়শ্যাম মেঘপুঞ্জে পড়ে নুমে নুমে
তমাল অর্জুন সর্জ নীপবৃক্ষরাজি
দশ দিশি অন্ধকার করি।

সেথা আজি
বিজন বিলুপ্তপন্থ গভীর গহনে
কিশোরী শ্রীরাধা ফিরে গোবিন্দের সনে
সঞ্চারিণী ক্ষণপ্রভা।

ঘনায় শর্বরী
ক্রমে মুগ্ধ মৌন হৃদি-বৃন্দাবন ভরি।

বোলপুর
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

খোয়াইডাঙা

হে খোয়াইডাঙা, আজ দিগন্তবিস্তৃত তব ছবি
উত্তরঅয়নারূঢ় গ্রহরাজ হৈমরশ্মি রবি
প্রসন্ন নয়নে হেরে অস্তঅচলের তীরদেশে
সংযমিয়া রথবেগ। পথচারী ভিক্ষুকের বেশে
আমিও এসেছি ; তব বালুকাকঙ্করময় ক্রোড়ে
স্থান দাও। সূর্য শশী তারা নই। উল্কা নই ওরে—
তা হলেও অকস্মাৎ অগ্নিবর্ণে বিস্মিত আকাশে
জীবন অঙ্কিত করি পরক্ষণে এই শুষ্ক ঘাসে,
এই তব উদাসীন উদার হৃদয়ে লভিতাম
নির্বাপিত শিলাখণ্ডরূপে আহা শাশ্বত বিরাম।
তবু স্থান দাও, তবু অচির মুহূর্ত ভ'রে ভ'রে
সীমাশূন্য প্রসন্ন বৈরাগ্য তব নিতে দাও মোরে
ক্ষুদ্র এ জীবনে।

পুনর্বার ফিরিয়া না আসি যদি,
সুদূর পশ্চিমে হেন মিলিবে মিশিবে নিরবধি
ধরিত্রী আকাশ এক চিররিক্ত আশ্চর্য রেখায় ;
আষাঢ়ের মেঘমায়া উত্তরের অরণ্যলেখায়
নীলাঞ্জন লেপি দিবে ; প্রতিদিন প্রভাত প্রদোষ
পূর্বে উদ্ভাসিবে তাল-খর্জুরের শ্রেণী ; কী সন্তোষ
জীবজননীর মরি অক্ষয় দাক্ষিণ্যে এইমতো
দক্ষিণের ওই মাঠে বর্ষে বর্ষে ভরিবে নিয়ত
কনকধান্যের ভার। উত্তালতরঙ্গস্তব্ধ হৃদি
সমস্নেহে ধরিবে তোমার গোপন মাণিক্যনিধি,
কঙ্কর, কণ্টকগুল্ম, শিলীভূত দীর্ণ বনস্পতি,
কৃষ্ণবর্ণ মাটির চাঙড় কীর্ণ দিকে দিকে— অতি-
পুরাতন দেবাসুরসংগ্রামের অস্থিতে আয়ুধে
অবশেষ ছিন্নভিন্ন স্মৃতি। সদা-অশ্রুত-বুদ্‌বুদে-

সমুত্থিত বারিধারা বালুলীন রবে কোনোখানে
শফরীজীবন আহা ; পতঙ্গেরা মধুর সন্ধানে
ফিরিবে যেথায় তীরে অলক্ষিত নীহারিকালোক
কণা কণা কুসুমে হসিত। হেথা অসঙ্গ অশোক
তালবৃক্ষে গৃধ্র ঘৃণাহীন ; নির্মমহৃদয় বাজ
উড়িবে শীকারআশে ; যবে ম্লান ম্রিয়মাণ সাঁঝ
পথিকের পদশব্দে অন্ধকারে টিট্টিভদম্পতি
পরস্পর সম্বোধনে মুখরিবে। বায়ু সদাগতি
কখনো পশ্চিম হতে জরাতুর মরুর হুতাশ,
কখনো দক্ষিণ হতে মলয়জ চন্দনের বাস,
কখনো হিমানীস্পর্শ, কখনো বা আর্দ্র হায়-হায়
বক্ষে বিস্তারিবে তব আজিকার মতো বরষায়—
কখনো নিশীথরাত্রে মধ্যাকাশে যবে সপ্ততারা
হেমকমণ্ডলু হতে ঝরাইবে হৈমরশ্মিধারা
শ্বাস রুধি রহিবে নিশ্চল।

ফিরিয়া না আসি যদি
অক্ষয় তোমার স্মৃতি প্রাণে তবু রবে নিরবধি।
দুঃখে সুখে তব নাম অন্তরে জপিব নিশিদিন ;
অবোধ হৃদয়ে প্রবোধিব, 'গৃহহীন, বন্ধুহীন
হও তুমি, তবু এক সীমাশূন্য প্রান্তরের বুকে
সীমাশূন্য আকাশ উপুড় করা, তাহারই সম্মুখে
কঙ্করে আস্তৃত জেনো আজও তব ধ্যানের আসন ;
আকাশ ধরিত্রী আর দিবসযামিনী, অগণন
জ্যোতির্ময় গ্রহতারা রবি সঙ্গী সেথা ; দুঃখ সুখ
নিন্দাস্তুতি প্রেমঘৃণা হৃদয়েরে উদ্‌বিগ্ন উৎসুক
নাহি করে। পূর্বকাল পরকাল নাই যদি থাকে,
বন্ধু বা প্রেয়সী কেহ যদি মূক আর্ততার ডাকে
সাড়া নাহি দেয়, যদি দয়ালু ঈশ্বর ভোলে তোরে—
হয় সে মনেরই ভুল— খোয়াইএর বালুকা-কাঁকরে

আসন বিছানো আছে তোর ; আছে অনাসক্ত প্রীতি ;
আছে সুখ ; বিমুগ্ধ-নয়ন-ভরা ভুবনের গীতি
দশ দিক ঘিরে আছে, গৃহহীন ! ওরে বন্ধুহীন !'

হে খোয়াইডাঙা, আজ মনে পড়ে বিদায়ের দিন
কতবার একা বসি অসীম ক্রোড়ের একদেশে
শিহরিত সত্তা মোর তোমার সত্তায় যেন মেশে
করেছিনু অনুভব। কোনোদিন তাই যদি হয়,
তাই যদি হয়, বন্ধু, জীবনের এ অশ্রুসঞ্চয়
ঝিরিঝিরি বয়ে যাবে বালুলীন তোমার ও স্রোতে ;
সোনালি সুনীল ফুল মোর সুখঅনুভূতি হতে
বিকশিবে বিহসিবে ; সীমাহীন শূন্যের প্রসারে
উর্ধ্বশির তালবৃক্ষে কণ্টকিত গুল্মের আকারে
চেতনা জাগিবে মোর— জীবনের পূর্ণ পরিণাম
মিলে যাবে।

হে খোয়াই, লও মোর বিস্মিত প্রণাম।

শান্তিনিকেতন
২ আষাঢ় ১৩৪৫

হরগৌরী

সারা দিন

তৃণতরুশূন্য, দগ্ধ, আতাম্র প্রান্তরে উদাসীন
একাকী আসীন ধ্যানমগ্ন।
নিদাঘরবির তাপে
জরাতুর পাণ্ডুর আকাশ। অনলশ্বসনা কাঁপে
দিগ্‌দিগন্তে মরীচিকা। দূরে দূরে তালতরুচয়
শিহরি শিহরি ওঠে, তর্জনীসংকেতে শুধু কয়

ত্রস্ত চরাচরে : তপোবিঘ্ন কোরো না রুদ্রের।

দূর

দিগন্তের অদৃশ্য কানন হতে উদাস ঘুঘুর
মন্ত্রময় সম্ভাষণ ভেসে আসে শুধু। সীমাশূন্য
দিক্‌শূন্য বিজনতা অহরহ বিরাজে অক্ষুণ্ণ
পক্ষবিধূননহীন অধউর্ধ্বে সদা। গূঢ় ফণী
কণ্টকগুল্মের মূলে বক্রগতি সঞ্চরে যখনি
তুর্বিষহ পিঙ্গল সে জটা তপস্যার তাপে।

হায়,

কলকল্লোলিনী গঙ্গা মহাশূন্যে মিলালো কোথায়
বিদেহিনী বাষ্পের উচ্ছ্বাসে ? নির্দয় কুম্ভকবশে
রুদ্ধগতি সমীরণ, পূরকে রেচকে কভু শ্বসে
বিশ্বব্যাপী ঘূর্ণহাহাকারে অগ্নিসূচী বালুকণা
উড়ায়ে উড়ায়ে।

রক্তচক্ষু ডোবে রবি। দিগঙ্গনা
তখনো সভয়, বদ্ধাঞ্জলি দিকে দিকে।

দূর হতে

নির্নিমেষ আরাধনে ঈশ্বরে পূজিয়া, অস্তপথে
এসে ফিরে যায় শুক্র। বিনিস্তব্ধ তিমিরের তীরে
সপ্তর্ষি কী মন্ত্র জপে। পা টিপিয়া চলে ধীরে ধীরে
দণ্ডপল।

রাত্রিঅবসানে পুন পূর্বগিরিশিরে
হোমকুণ্ডে জ্বলে নব দিবসআহুতি নব রাগে।
দীর্ণ দগ্ধ আতাম্র প্রান্তরে নিত্য উদাসীন জাগে
ধ্যানমগ্ন।

ক্ষমা মাগে আর্ত ত্রিভুবন।

তপস্বীর

চরণে প্রণমি তবে বিরাজেন কৃতাঞ্জলিস্থির
সন্নতনয়না গৌরী। শ্রীঅঙ্গের চম্পকবিকাশ

হৈমকান্তি রবিকরে সম্বরিয়া বলেন, দিগ্‌বাস,
প্রসন্ন নয়ন মেলো।
লুপ্তবিশ্ব ধ্যানের গহনে
ধ্রুবরশ্মি-হেন পশে সে প্রার্থনা নিঃশব্দগমনে
সুস্মিত সুন্দর। রোমাঞ্চিত যোগীশ্বর ধীরে-ধীরে-
উন্মীলিত ত্রিনয়নে হর্ষাবেশে হেরেন গৌরীরে
চরণে প্রণতা, কুসুমস্তবকভারে পারিজাত-
লতার মতন।
ধীরে ধীরে সপ্রণয় দৃষ্টিপাত
বিস্ময়ের জোয়ারের বেগে হৃদয়ের দুই কূলে
প্লাবন বহায়ে ফিরে আসে। প্রমত্ত আবেগে ভুলে
মহেশ্বর। অধীর দক্ষিণপদভঙ্গীতে সহসা
তাণ্ডবিত উৎসব সূচনা করে ; বিত্রস্তা বিবশা
দিগ্‌বিদিক্ উল্লঙ্ঘিয়া শত শত প্রমথ ভৈরব
ধূলান্ধ আকাশে ধেয়ে আসে, অট্টহাস্যকলরব
ভীমপক্ষে প্রসারিয়া ঝঞ্ঝাগরুড়ের। দিগ্‌বারণ
মেঘমালা বিদ্যুৎঅঙ্কুশাঘাতে কে করে বারণ—
ধায় সে উৎসবে গুরুগম্ভীর বৃংহিতে।
ওঠে দুলে
আনন্দে আবেগে বক্ষ অদৃশ্যা গৌরীর। পদমূলে
মুগ্ধদৃষ্টি যুক্তপাণি বিহ্বলা শিবানী।
যবে ক্রমে
শান্ত হয় নৃত্যময় সে কালবৈশাখী, শূন্যে ভ্রমে
অনন্ত নক্ষত্রলোক আশায় শঙ্কায়।
প্রতিদিন
এ তপস্যা, এই আরাধনা, ধ্যানমগ্ন উদাসীন
শঙ্করের সংজ্ঞা লভি তাণ্ডবউন্মাদ।

অবশেষে
লুপ্তদিবা তমিস্রশ্যামল প্রাবৃটে একদা হেসে

উন্মুদিতা প্রিয়ারে নটেশ আলিঙ্গিয়া বক্ষে ধরে।
সুখমন্দীভূত নৃত্যে থিয়া-থিয়া ভূতলে অম্বরে
পড়ে পদ। ডমরুর গুরুগুরু ক্বণিত কঙ্কণে
মিলে যায়। চরণে চরণে ফণী ভায়, মণিগণে
ধাঁধে অন্ধকার। শূন্যে বিস্তারিত কৃষ্ণজটাজূটে
গঙ্গা নামে এই কি প্রথম ? ব্রহ্মার অঞ্জলিপুটে
অথবা বিষ্ণুর জ্যোতিষ্মান পদমূলে তুষ্টি কোথা—
ঝর্ঝর শীকরে ঝরে।

নাচে শিব, শিবাঙ্গসঙ্গতা
নাচে গৌরী। রাত্রিদিবাস্মৃতিশূন্য কালের অয়নে
নাচে অর্ধনারীশ্বর ; ক্ষণোন্মেষ নয়নে নয়নে
রৌদ্রজাগরণী আর কৌমুদীস্বপন ক্ষণশেষে
আবেশে হারায়ে যায়।

শরতে শ্যামল-নীল বেশে
দিকে দিকে বিকীরিয়া শ্রীঅঙ্গের অপরূপ দ্যুতি
কাশফুল্ল গ্রামোপান্তে. অবিরলকলকলস্তুতি
নদীকূলে, স্নিগ্ধচ্ছায়া নিবিড় কাননে, ভগবতী
শান্তিরূপে বিরাজিতা। শেফালিকা বকুল মালতী
মাঙ্গলিক লাজ বর্ষে। ওঠে সদা হর্ষহুলুধ্বনি
পিক-পাপিয়ার স্বরে।

শিশিরে যেদিন দিনমণি
ম্লানদীপ্তি, শস্যভারে ফলি ওঠে আলোককাঞ্চন
দেবীর প্রসাদস্পর্শে ; ফলভারে বন উপবন
নত হয়। স্বর্গ ত্যজি এ ভুবনে অন্নপূর্ণাবেশে
সন্তানেরে অঙ্কে ধরি বিরাজে জননী ; স্নেহাবেশে
নির্ভূষণা, হৈমবতী।

সর্বত্যাগী হোথা মহেশ্বর
উত্তরের তীক্ষ্ণ তীব্র বায়ুস্রোতে সঁপি কলেবর
শূন্যে ভাসে ; অনন্ততুষারাবৃত রিক্ত মেরুদেশে
স্থাণুগিরিবরসম তুষারবিনিন্দী শুভ্রবেশে
রহে জাগি। ভূতভবিষ্যৎলিপি সৃজনপ্রলয়
নির্নিমেষ নেত্রপাতে তারাদীপ্ত নীহারিকাময়
শূন্যে জাগে। রবিহীন অতিদীর্ঘ অমাযামিনীতে
বর্তমান লুপ্ত হয়।

সুপ্ত স্মৃতি হৃদয়নিভৃতে
একদা জাগিয়া ওঠে ; প্রণয়ের পুলকে লজ্জায়
চিরতরুণী প্রকৃতি আজি কি প্রথম শিহরায়
বিকশিত দিব্যদেহে, অঙ্গে অঙ্গে, অণুতে অণুতে,
জাগরণে স্বপ্নে ভাবনায় ! একটু ছুঁতে না ছুঁতে
প্রাণস্পর্শমণি দিয়ে, দূরে যায় শিশিরশর্বরী ;
মুঞ্জরে ধরার ধূলি ; কুহেলিকাআবরণ সরি
সুনীল অনিলপথে স্বর্গ হতে অপ্সরকিন্নরী
নামে স্বর্ণ-কিরণে-কিরণে লীনতনু।

উদাসীন
তপস্বীরে স্মিতসম্মোহিনী বধূ করে প্রদক্ষিণ
মুগ্ধ নৃত্যে প্রতিদিন সখীসঙ্গে মিলি। বনে বনে
বিটপীলতায় তৃণে অর্ঘ্য হ'তে অরুণে কাঞ্চনে
পুষ্প ঝরে। দক্ষিণপবনে কস্তূরীকুঙ্কুমবাস
উদাসীর সর্ব অঙ্গে ফেলে মুগ্ধ মধুর নিশ্বাস
নবভাবে উদাসিয়া তারে। অবিশ্রুত শত সুর
বিহঙ্গকূজনে মিশি রোমাঞ্চিত করে দিগ্‌বধূর
ললিত কপোল। আহা, রোমাঞ্চিত করে গো প্রেমিক
যোগেশ্বরে।

অবশেষে অঙ্কে ধরি হেরে নির্নিমিখ
ভবানীরে ভবেশ শঙ্কর। দিকে-দিকে-স্বচ্ছ-স্থির

পূর্ণিমার একমাত্র স্বপ্নাদর্শে ভবভবানীর
সে আলেখ্য আঁকা পড়ে বুঝি।

মধু-মাধবের রাত
গত হয়ে পুন আসে রৌদ্রোজ্জ্বল নিদাঘপ্রভাত

পুন উদাসীন
ধ্যানমগ্ন একা সমাসীন.
তৃণতরুশূন্য দগ্ধ আতাম্র প্রান্তরে সারা দিন।

শান্তিনিকেতন
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

গান

এই বাদলধারায়
কে আসে!
আমার অন্তর দিশা হারায়
স্ফুটকদম্বসুগন্ধে মিশা
কী গোপন নিশ্বাসে!
কে আসে!
দিবস মুদিল আঁখি।
কোন্ পাখি
জড়িত কাতর কণ্ঠে ওঠে কি ডাকি
নির্জনবনবাসে!
কে আসে!
এ যে ইন্দুতারকাবিলুপ্ত শর্বরী
এল অম্বরে, বন মর্মরি মর্মরি
কাহারে যে সম্ভাষে!
কে আসে।

১৩৪৫

শরৎশেষে

সাশ্রু মেঘে অকাল শ্রাবণী
ঘিরেছিল আকাশ অবনী
দিনশেষে।
স্নিগ্ধশ্যাম বেশে
বিপুল ধানের ক্ষেত
শিহরি শিহরি ওঠে ; কী গূঢ় সংকেত
দিগন্তে অঙ্কিত করে তালতরুশ্রেণী,
এলাইয়া নীলাভ্রের বেণী
স্তব্ধ স্থির
শালবনানীর
ঊর্ধ্বদেশে
অকাল শ্রাবণী যবে জাগে দিনশেষে।

অর্ধরাতে শেফালির মৃদুমধু বাস
জানাইল কুশলসম্ভাষ—
লাজে-ভয়ে-বাধো-বাধো বাণী।
জেগে দেখি স্বপ্নজালখানি
সুপ্ত বিশ্বে বিছায়েছে চতুর্থীর চাঁদ, ধীরে ধীরে
কখন জাগিয়া শান্তসরোবরতীরে
বেণুবনঅন্তরাল সরাইয়া দিয়া সাবধানে।
সহসা জাগিল বায়ু ; বিরাম না জানে
মৃদুমর্মরিত ধ্বনি অশ্বত্থপল্লবে ;
চকিতবিহঙ্গকলরবে
সুপ্তিবিজড়িত স্বর।

শান্ত হ'ল সব। পুন প্রশ্ন সুমধুর
বিনিদ্র শেফালিস্বরে জাগে
শরৎশেষের ; অনুরাগে

লাজে ভয়ে বাধো-বাধো বাণী—
অর্থ নাহি জানি।

শ্রীনিকেতন
৩০ আশ্বিন ১৩৪৫

পথের দু ধারে

যাই আসি ; পথের দু ধারে
নতমুখী মঞ্জরীর ভারে
শোভে স্নিগ্ধ শ্যাম ধান-ক্ষেত।
দিক্‌চক্রে আম জাম বেত
আঁকে ঘন নীলাঞ্জনরেখা।
উত্তর দিগন্তে যায় দেখা
শ্রেণীবদ্ধ বাষ্পলেখাবৎ
অচল পর্বত ;
মেঘবাষ্পে কভু পড়ে ঢাকা।
ছিন্ন-মল্লিকার-মালা-আঁকা
জলার ওপারে কভু ওড়ে বকগুলি।

উষা ও গোধূলি
চিহ্নহীন নীলাম্বরে আনাগোনা করে প্রতিদিন,
আমি ফিরি গেরুয়ারঙিন
এই ধূলিপথে।
বাতাসে আলোতে
নবমুঞ্জরিত ধান কানাকানি-শিহরণে রটে
কী বারতা বলয়িত দূর দিক্‌পটে।

শ্রীনিকেতন
১ কার্তিক ১৩৪৫

তাল গাছ

সারি সারি শুধু তাল গাছ
জটলা করেছে হেথা। তাদের পাতার নাই নাচ
এ প্রদোষে উতলা নিশ্বাসে
বাতাসের। ঘিরিয়া রয়েছে চারি পাশে
সুবিপুল ম্লান দিগ্‌বলয়।
অদোসর তারার উদয়
স্বর্লোকসুষমাভাস আনে
ধূলিময়ী ধরিত্রীর প্রাণে।
আবছায়া-ছবি-হেন সাঁওতাল পুরুষ ও মেয়ে
গেছে ভাঙা খোয়াইডাঙার পথ বেয়ে
দিনশেষে গৃহোৎসুক আক্লান্তহৃদয়।

শুষ্কতৃণ বিকীর্ণকণ্টকগুল্মময়
এ বিজনে শুধু তালগাছ
সারি সারি দাঁড়াইয়া। তাদের পাতার নাই নাচ।
গূঢ় হর্ষস্রোত বয়
অহর্নিশ অবিচল ঋজুদেহ-ময়!
মুখে নাই বাণী।
ধরেছে মস্তক পেতে স্তব্ধ আকাশের ছাদখানি।

শান্তিনিকেতন
২ কার্তিক ১৩৪৫

আশ্বিনের অবসানে

আশ্বিনের অবসানে
পাতা-ঝরা পউষের ডাক
এল মোর প্রাণে।
আর দেরি কই!

কেন ঘাট আঁকড়িয়া রই ?
জোয়ার-জলের আন্দোলন
শেষ হল বহুক্ষণ।
এবার ভাঁটার টানে
কুহেলিগুণ্ঠিত মৃত্যু-সাগরের পানে
যেতে হবে।

আপক্ক শস্যের নত মঞ্জরী নীরবে
ঝরিছে শিশিরছলে প্রভাতবেলায়।
শেফালির অবশেষ লাজাঞ্জলি লুঠিছে হেলায়
বিজন কাননকোণে।
কলকণ্ঠনীরব বেলায় ঘুঘুর কূজন শোনে
বাষ্পছলোছলোদৃষ্টি বিষণ্ণ দিগ্‌বালা।

প্রাণের গানের পালা
শরতের স্বর্ণকান্তি আলোর উৎসবে
শেষ হ'ল সূচনায়। কোথা যেতে হবে
গানহীন প্রাণহীন পরমনির্বাণে
মৃত্যুর আহ্বানে।

শান্তিনিকেতন
৬ কার্তিক ১৩৪৫

মৃত্যুকাম

মৃত্যুকাম আমি
অধীর আগ্রহে দিবাযামী
দণ্ড পল গণি
স্বর্ণশস্য-ভরা ক্ষেত নেহারি যখনই,
হেরি চন্দ্র-তারার উদয়,
নীরব নির্জন বনময়

বিরহীবিহঙ্গস্বর
কভু শোনা যায় কভু পল্লবমর্মর,
অপরিচিতের মুখে অপরূপ হাসি
জন্মান্তরস্মৃতি উদ্ভাসিয়া জানায় প্রবাসী
নির্বাসিত আমি এ ভুবনে।

হায়, ধৈর্য ধরিব কেমনে
ক্ষণে ক্ষণে সুন্দরের বিদ্যুদ্দরশে,
ভেসে-আসা চকিত পরশে,
জানি মনে জানি যদি
তমিস্রনিগূঢ় কোণে নিভৃত হৃদয়ে নিরবধি
সুর-বাঁধা বীণ
ঝুরিছে ঝুরিছে নিশিদিন
নীরব রোদনে— যতক্ষণ
উত্তরিয়া নাহি যাই জীবন-মরণ
আলো-অন্ধকার
গুণীর সোহাগে তার চিরঅন্তর্লীন
গান বাজিবে না, হায়, বাজিবে না বীণ।

শ্রীনিকেতন
৯ কার্তিক ১৩৪৫

হৈমবতী

আশ্বিনের অবসানে
মাঠ-ভরা ধানে
শ্যাম পটে আঁকা পড়ে সোনা।
বনপথে আলোছায়া বোনা
ম্লানরাগে। হৈমন্তী কুয়াশা
প্রকৃতির রূপরাগবিচিত্রিত ভাষা
মুছে দিল এখানে সেখানে।

আশ্বিনের অবসানে
কৈলাসশিখর হতে
হুহু বায়ুস্রোতে
আসে কী খবর !
গাছে গাছে পল্লবের স্তর
শিহরিত, চঞ্চলিত, চকিত, বৈরাগে
পীতবর্ণ, স্খলিত ধূলিতে।
জাগে
ঊর্ধ্বশির হিমঝুরি,
শত শত প্রস্ফুটায় হিমশুভ্র কুঁড়ি—
দিকে দিকে অপরূপ ঝালর-ঝুলানো কী রূপমাধুরী
গাঢ়তর সবুজের বিতানে বিতানে
শীতআবাহনে নগ্ন শিবের আহ্বানে।

আশ্বিনের অবসানে
বিহঙ্গ গায় না গান।
শেফালির লাজাঞ্জলি-দান
সিঁদুর-রঙানো অবসান
দেবালয়দ্বারে।
রিক্ত মহানিমশাখে গুচ্ছ গুচ্ছ ফলের আকারে
স্বর্ণকান্তি গুটিগুলি ধরে
জপের মালার তরে কোন্ তপস্বীর—
নির্বিচল তালবনানীর
এক পদে স্থির
ভক্ততরুরাজি
আজি
সে কথা কি জানে !

শান্তিনিকেতন
কার্তিক ১৩৪৭

রাত-জাগা পাখি

কবি নই, রাত-জাগা পাখি
নিষুপ্ত ভুবনে জেগে থাকি
একা আমি।
নির্নিমেষ দৃষ্টি অনুগামী
পরিক্রমাপর সপ্তর্ষির।
নীরব নিস্তব্ধ যামিনীর
হৃদয়ে কখনো ডানা মেলি
পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে চাঁদের চামেলি
যখন কৌমুদীদলে
ঢাকে জলে স্থলে।
কভু কারে ডাকি।
আমি এক রাত-জাগা পাখি

ঝাঁঝা
পৌষ ১৩৪৫

কৃষ্ণা নবমী

চুরি ক'রে কখন এসেছ, চোর,
নির্বাক্ থামের গায়ে বারান্দায় মোর
উদ্ভিন্ন কৌমুদীদলে একান্তে পরশি—
নিশীথে উদিত কৃষ্ণনবমীর শশী,
হে অলোক চন্দ্রমল্লী,
সঘনপল্লববল্লী
এড়াইয়া শাল-তাল-মহুল-বনের।

নীরন্ধ্র স্বপ্নের
অন্ধকার অলিতে গলিতে
একা আমি চলিতে চলিতে

হয়েছিনু অবরুদ্ধশ্বাস,
বিভীষিকা ত্রাস
জেগেছিল চতুর্দিকে।

অকস্মাৎ জেগে দেখি চিরসপ্তর্ষিকে
উত্তর আকাশে।··· আর,
তুমি কে ? তুমি কে এলে স্বপ্নের সকাশে
স্বপ্নের অতীত শোভা লয়ে,
কাষ্ঠলোষ্ট্র-ইষ্টক-আলয়ে,
ঈষৎগুণ্ঠিত একা নববধূ যেন—
লাজকুণ্ঠ পদক্ষেপে ঝিমিঝিমিত নূপুরের হেন
ঝিল্লিরব !
স্বপ্ন নও, স্বপ্ন নও তুমি করি অনুভব।
অস্বপ্নসম্ভবশোভাময়ী
কে তুমি আসিলে অয়ি
অযোগ্য আলয়ে ?—
এলে বা কখন ?

যদি নিদ্রানিমগন
কেটে যেত রাত
উজ্জ্বল মুখর হায় আমার প্রভাত
হারাতো তোমারে।
উদ্‌ভ্রান্ত কর্মের পাকে ধূসর ধূলির পারাবারে
এ বারতা থেকে যেত চিরসংগোপন,
হয়তো বা নর্মসখী নহে কোনোজন
বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীর, তবু দীর্ঘ রাত্রিশেষে
এসেছিল, হেসেছিল, ফিরে গিয়েছে সে
ভীরু চন্দ্রকর—
সুপ্ত বারান্দায়, থামে, শয্যার উপর।

১ পৌষ ১৩৪৫

অনেক রাত বাকি

এখনো অনেক রাত বাকি।
নীড়ে নীড়ে সুপ্ত সব পাখি।
কোথায় কীটের আনাগোনা
শিয়রে খড়ের ছাদে, ক্ষুব্ধ ক্ষুন্ন ফেরুর ঘোষণা
থেকে থেকে পাহাড়ের 'পরে—
শান্তিভঙ্গ নাহি করে
জাগ্রত নক্ষত্রলোক হতে
সুপ্তপথে
ধূলিসীমাবধি
পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্যের। যদি
সাঁওতালি মৃদঙ্গের মাদলের রোলে
করতালঝঞ্ঝনায় অকস্মাৎ আতঙ্কিয়া তোলে
দূরান্তের ট্রেন-অভ্যাগমে,
মিলাইয়া যায় ক্রমে
দূর দিগন্তরে।
সীমাশূন্য উর্ধ্ব হতে ঝরে
ধ্রুব আর সপ্তর্ষির কর,
যেমন ঝরিছে যুগে যুগে, ঝরিবেও অতঃপর
জীবশূন্য জনশূন্য মর্তহৃদে নিরবধি কাল।

এখনো অনেক রাত বাকি। কখন্ সকাল
রোমাঞ্চ জাগাবে এই গুণ্ঠিত আঁধারে—
যে এখানে নামহীন নদীটির ধারে
পনস-রসাল-শাল-মহুলের বনে
প্রতীক্ষায় আছে একমনে
আমারই মতন।
চমকিত উর্ধ্বে চাব: ভাস্বতীর সীমন্তরতন
কৃষ্ণত্রয়োদশী চাঁদ আর শুকতারা

করে ঝিক্ ঝিক্ ;
অরুণউদয়ে দশ দিক
দাঁড়ালো স্থনীল দেহ স্থবর্ণেতে ঢাকি।
এখনো অনেক রাত বাকি।

ঝাঁঝা
২ পৌষ ১৩৪৫

বিদায়ভূমিকা

আলোকিত এ পৃথিবী থেকে
একদিন যেতে হবে জানি।
দূরের আহ্বান বাণী
লয়ে মোর প্রাণে
কে যেন এসেছে কেবা জানে।
মাঝরাতে জেগে উঠে
শুনি যেন অন্তঃশ্রুতিপুটে
গুঞ্জনিছে একতারা হাতে
ভোরের ভৈরবী ;
স্বপ্ন অগোচর কোন্ সুদূর প্রভাতে
উদিবে যে রবি
কিরণকরুণা তার
এনেছে আমার
প্রাণের গোপনে
সেই তান, সেই তার
এ বিশ্বাস জাগে মুগ্ধ মনে।

আলোকিত এ পৃথিবী থেকে
যাব আমি, জেনে যাব নিভৃত বক্ষে কে
বেঁধেছে এ বাসা।

সে কি মৃত্যু ? সে কি, হায়, মৃত্যুর অতীত ভালোবাসা ?
একদা অন্তিমক্ষণে
অনাহত অস্পৃষ্ট শ্রবণে
অভিনব প্রিয়নাম ধ'রে
সম্বোধিবে মোরে।
উচ্চকিত আত্মপরিচয়ে
যাব কোন্ নূতন আলয়ে
ক্লান্ত এ প্রাণের
তখনি তাহারে অনুসরি
নবজীবনের কোন্ নূতন গানের
দীক্ষা লব মরি !

অন্তিম-বিদায়-কালে
বলা হবে না তো কিছু ; অশ্রুবাষ্পজালে
জড়াব না পিছু-চাওয়া চোখ,
নূতন-ভুবন-ভরা নূতন আলোক
সম্মুখে যাহার।
আজ বলে যাই :
এ ধূলার
প্রতি কণা লেগেছিল ভালো।
এ আকাশ এই আলো
বারম্বার গান গেয়ে উঠেছিল প্রাণে—
নদীগিরিবনপারে,
পণ্যপূর্ণ রাজপথে,
পুণ্যস্মৃতি মন্দিরের দ্বারে,
সন্ধ্যায় প্রভাতে,
নক্ষত্রখচিত মাঝরাতে।
দু-চারিটি কণ্ঠস্বর দু-চারিটি মুখ
অমৃতের পূর্বাস্বাদে অন্তর উৎসুক
করেছে চকিতে কতবার।

নয়নে আমার
যাহা ধরে নাই
প্রাণে গেঁথে গানে গেঁথে তাই
ব'লে যাই আজ :
সব-কিছু ভালোবাসিয়াছি—
দুঃখসুখ অশ্রুহাসি।
হে ভুবন, এ প্রবাসী
হৃদয়ের একটি চুম্বন
রহিল ধূলারই কাছাকাছি
চির-লোক-চলাচল-পথে

ঝাঁঝা
৩ পৌষ ১৩৪৮

চাঁদ

তোমারে দেখেছি চাঁদ,
কত রাতে,
কত প্রাতে—
স্বর্লোকলক্ষ্মীর পদতল
ছুঁয়ে আছে যে কমল
তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত তারই একটি সে দল
অরুণউদয়কূলে।
ভাষা ভুলে
ক্ষণে ক্ষণে ঊর্ধ্বে তুলে আঁখি
আজও চেয়ে থাকি—
সিততৃতীয়ার স্বর্ণলেখা
ওই-যে লিখিছ তুমি প্রতীচীর ভালে।
তুমি একা,
আমি একা আজ সন্ধ্যাকালে।

কত প্রাতে কত রাতে
শুক্লপক্ষ এমন সন্ধ্যাতে
তোমারে দেখেছি, তবু
মনে হয় কভু
দেখা হয় নাই।
প্রথমবিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে চাই
আজ তোমা-পানে,
প্রথমউদিত ইন্দুলেখা। অন্তরে কে জানে
কী সুখ কী ভয় মরি
নীরবে প্রতীক্ষা করি
পূর্ণিমার নিটোল পূর্ণতা।

দিনে দিনে
তুমি তো আসিবে নীল শূন্যে পথ চিনে,
একদিন পূর্ণ দৃষ্টি মেলে
কবে স্বপ্নকথা
নয়নে নয়নে
প্রান্তর কান্তার সুধা-
সমুচ্ছল শুভ্র সিন্ধু-সনে —
দূর হিমগিরিশিরে।
সুপ্ত যদি থাকি গো শয়নে
সম্পূর্ণ সে সুষমায় কত দিনে ফিরে
আসিবে অতিথি ?
মর্মরিবে জ্যোৎস্নাসিক্ত দেবদারুবীথি,
ক্ষণে ক্ষণে কুহরিবে কোথা কোন্ পাখি,
চন্দ্রমল্লিকা কি
জমাট কৌমুদী সবখানে
ভুল হবে প্রফুল্ল উদ্যানে,
বালুকাসৈকততলে মন্দস্রোত উলাইএর জল
হয়তো শফরীগুলি করিবে চঞ্চল—

গৃহ হতে ছাদ হতে
আধখোলা বাতায়নপথে
উঁকি দেওয়া হলে
নিশাশেষে তুমি যাবে চ'লে।

অস্তাচলে গেছে চলে তৃতীয়ার চাঁদ
আমার এ দেখিবার সাধ
বুঝি উপহাস করি। শেষ ঝিকিমিকি
তাও দেখি নি কি
মহুয়াশাখার অন্তরালে ?
নতদৃষ্টি সেই কালে
কী লিখিনু ছাই !
ঊর্ধ্বে চাঁদ নাই।

ঝাঁঝা
৮ পৌষ ১৩৪৫

চন্দ্রমল্লিকা

হে গোলাপ, লুব্ধ মোর করতলে ধরা দিলে যেই
সেই শোভা নেই
সেই গন্ধ !
যে বিস্ময় যে আনন্দ
চিত্তে ভরি দিলে
যতক্ষণ ছিলে
আপনার বৃন্তটিতে আপনার ডালে,
হায় তারে কোথায় লুকালে ?
হয়তো পড়িয়া রবে কিছুক্ষণ পরে
তোড়াবাঁধা ব্র্যাকেটে পাথরে।
অনাদরে

দলগুলি ঝরে যাবে,
তুমি মরে যাবে
প্রভাতের আগে—
ব্যথাতুর অনুরাগে
লক্ষ্য করিব না। ক্ষমা কোরো সেই অপরাধ।

জানি আমি কৃষ্ণপক্ষ চাঁদ
কালে কালে যেই কলাগুলি
আঁধারে দিয়েছে বিসর্জন, ধূলা হতে তুলি
চন্দ্রমল্লিকার ফুলই
সঞ্চয় করেছে সব।
শত কলরব
চারি ধারে
তারে
স্পর্শ করিল না কেন সারা দিনমান!
চন্দ্রিকা-জমানো মুগ্ধ-স্বপ্নমগ্ন-প্রাণ
ফুটে আছে কাননের
এক ধারে। জানি রাত্রে মোর স্বপনের
একেবারে
সব ঠাঁই সব ধারে
ফুটিবে এ ফুল
নিরাকুল
সুষমায়।
করতলে ভরি নাই তায়—
উদ্যানের সীমানায়
ফুটে আছে গাছে,
স্বপ্নে ফুটিয়াছে।

ঝাঁঝা
৯ পৌষ ১৩৪৫

জগৎ

কোথা দিল্লি কোথা হরিদ্বার,
শব্দের সাগরে তোলপাড়
উন্মত্ত গতির বেগে।
সারাক্ষণ সারা দিন, রাত্রে জেগে জেগে,
ট্রেনের জানালা থেকে
বারম্বার যে পৃথিবী নিয়েছি গো দেখে—
নদী গিরি, কূপ সরোবর,
বিচিত্র শস্যের ক্ষেত,
নামহীন গ্রামের সংকেত
তরুঅন্তরালে,
অকস্মাৎ উন্মোচিত হেথা এক কালে
অর্ধেক শহর,
প্রান্তর কান্তার যেন সব নিয়ে বয়ে যায় ঝড়
কভু দ্রুত কভু শান্ত লয়—
ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে এক দিগ্‌বলয়
অন্য দিগ্‌বলয়ে মেশে.
বিভিন্ন স্টেশনে এসে
বিচিত্র যাত্রীর ওঠানামা, কখন নিমেষে
ধূর্জটিজটায়-ইন্দুলেখা-অনুকারী
শান্ত গঙ্গাবারি
কাশীর মন্দির মঠ মিনারের তলে,
কাছে এসে সরে যায় রাজপথ, বাতাসে সঙ্কুলে
মুকুলিত নিমের বীথিকা,
বধূ অনামিকা
নিম্নে ছাদে মেলে শাড়ি তার,
চলেছে উটের সার,
কৃষক সলিল সেঁচে—
এক পলকের দেখা কত কী মিলায়ে গেছে

স্মৃতি হতে, কত বা রয়েছে
অকস্মাৎ কাজের ভিতরে
কোনো দ্বিপ্রহরে
দেখা দিতে
কিম্বা কোনো বিনিদ্র নিশীথে
বাক্যহারা বিস্ময়ে মোহিতে 'কার এই মুখ'—
বারম্বার কী যে বিস্ময়উড্ডীন সুখ
নয়নে ও মনে জাগিয়াছে ট্রেনের জানালা থেকে
প্রবাহিণী যে পৃথিবী দেখে
তারে মনে হয় সত্যতর।

এই বড়ো
বিস্ময়, সেখানে মুক্ত দ্বার
প্রতি ক্ষণে যাওয়ার আসার ;
অহেতুক
নানা যত্ন পরিশ্রম দুঃখ আর সুখ
ল'য়ে খেলা করে লোক পল্লীতে প্রান্তরে
ঘরে ঘরে ;
জঙ্গলের গাছ
সতেজ সবুজ, ডালে খঞ্জনের নাচ,
মূলা আর সরিষার ফুল,
কূটজ-অনন্তমূল-
লুঠ-করা সৌরভঝলক—
তর্কহীন স্থির অপলক
প্রত্যক্ষ বিষয় শুধু যতক্ষণ আছে :
গৃহে গৃহে জীবযাত্রা, পুষ্প গাছে গাছে

পৌঁছিয়া পথের শেষে
অচেনা বিদেশে

এই বোধে কিছুকাল
ভালোবাসি ধূলামাটি, সন্ধ্যা ও সকাল,
ঘরবাড়ি, লোকজন।
আবার কখন
অভ্যাসের ধূলিস্তর করে আবরণ
সৌন্দর্যেরে।

নিরুত্তর প্রশ্ন ঘোরে ফেরে
মনে অনুক্ষণ :
এ কি খেলা? এ কি প্রাণপণ?
শিয়রে ওই-যে তারালোক,
যেমন তেমন হোক্
নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা,
বিধাতার চিতে
নিঃসীম নিভৃতে
এক সঙ্গে ওরা সত্য আর স্বপ্ন নয়
অহেতুক কল্পনার আপেক্ষিক কালে দ্যুতিময়
খদ্যোতের দল
অস্তিত্বের আনন্দে চঞ্চল?
আর, এ পৃথিবী,
যুগ-যুগান্তর-পর্বে জীবনেতিহাস, জ্বলি নিভি
সুখে দুঃখে জীবনে মরণে,
স্থিরাকাশপ্রতিম স্মরণে
এও কি বিচিত্র-আলো-লেখা?
কবি কি বসিয়া থাকে একা
কল্পনালীলার শেষে
আপনারই অন্তরে, অশেষে?

ঝাঁঝা
১০ পৌষ ১৩৪৫

প্রত্যাশী

এখনো অনেক রাত বাকি।
এখনো গাহে নি কোনো পাখি
তিমিরগহন ঘন মনোবনবাসে।
সুদূর অরুণোদয় -আশে
একা জেগে থাকি।
এখনো অনেক রাত বাকি।

তালীতমালেরই বন' -তল
জ্বলি নিভি জোনাকি কেবল
ঐ উজ্বলিছে।
তারকিত আঁধারের নীচে
জোড়হাতে যামিনীর পিছে
একা জেগে থাকি।
এখনো অনেক রাত বাকি।

ফুটে নাই সিতশতদল।
দূর তারকার ফুটে ভাতি অচপল
সরসী মুকুরপুটে।
অলখ উর্মি উঠে
মৃদু সমীরণে
শিহরিয়া কিরণে কিরণে
গগনের তারা কথা কয়
এ সলিলময়।
তারকিত আঁধারের নীচে
জোড়হাতে যামিনীর পিছে
আলোকতৃষিতচিত যেজন জাগিছে
একা জাগে অপলকআঁখি।
এখনো অনেক রাত বাকি।

উদার অরুণোদয় কবে দিবে হানা
মোর হৃদয়ের নীল নিখিল সীমানা
অরুণে ও কাঞ্চনে প্লাবি
গহন মনের বনে একা বসে ভাবি।
ঐ কি ডাকিল কোনো পাখি ?
প্রথম সে অরুণলেখা কি
প্রাচীদিগ্‌ভালে
ঢাকা পড়ে পল্লবজালে ?
না গো, এই কাক-জ্যোৎস্নায়
পেঁচা উড়ে যায়।
উল্কা খসিল হায়।
আমি জেগে থাকি।
এখনো অনেক রাত বাকি।

ঝাঁঝা
৯ পৌষ ১৩৪৫

অপরাধী

হে আলোক, ক্ষমা করো শত অপরাধ।
ঘিরিয়া রয়েছে যেই আঁধার বিষাদ
ঘন অবসাদ
ফেলিয়া যেয়ো না তাহে
আজিও যদি না গাহে
বিহগের স্বর
কুসুমকাঙাল মোর মূক শাখা-'পর
এসো, ফিরে যেয়ো না, যেয়ো না।
কিরণকরুণাকণা
করো বিতরণ
ওগো, তিমিরহরণ।
ক্ষম মোর শত অপরাধ।

প্রাণে ছিল আলোকেরই সাধ।
যতদূরে জীবনের মূল
পশিল ধূলিতে
সে কেবল ফুটায়ে তুলিতে
আলোপরশিত তুটি হরষিত ফুল
নিঃসীম নীল গগনেতে
যেথায় প্রতীক্ষিত পূত লগনেতে
তব থির নয়নের হাসি
উঠে উদ্‌ভাসি
অগণিত স্বরগের সকল বিভব।
কীটে-কাটা কুঁড়ি মোর। ধূলা হল সব
পরানের পূত আশা।
পিশাচীর ভালোবাসা
অনন্ত রাতে
সর্পিল আঁধার ধাঁধাতে
ভুলালো ভুলালো :
নিখিল জীবের, মোর জীবনের আলো,
কিরণকরুণা ঢালো
তমোনিবারণ :
ক্ষম মোর শত অপরাধ।

আজও যেথা সাধে বাদ
আলোবৈরীরা হায়, সেথা কী কারণ
তুমি বা উদিবে আসি যে তুমি কমলা
অলক্ষ্য -রূপিণী অমলা
আপনারই মহিমায় আপনি বিরাজো।
এ জীবনে আজও
তব পদপাত-তরে কোনো আয়োজন নাই নাই—
আলোকঅগ্রদূতী কত জন ফিরে যায় তাই,
তোমার করুণা ফেরে লাজে সংকোচে।

তবে গো কেমনে ঘোচে
বলো আমার অগাধ
এই দুর্গতি ?
ভগবতী,
ক্ষম অপরাধ।
হে আলোক, ক্ষম মোর শত অপরাধ।

ঝাঁঝা
১১ পৌষ ১৩৪৫

বন্ধন

কী গূঢ় বন্ধনডোরে
এখনো আমায় ধ'রে
রেখেছ পৃথিবী !
অমূলক-স্বপ্ন-জীবী
নিরর্থক-শব্দ-মোহ-মুগ্ধ এ প্রাণের
অলীক-আনন্দ-ময় সম্বল গানের
ফুরালো নিঃশেষে।
উপবাসী ভিক্ষুকের বেশে
বসে আছি আজ
সীমাহীন সৌন্দর্যের মাঝ
ধূসরে শ্যামলে নীলে
ছায়াতপ মিলে
অহরহ যেথা সৃজে অপরূপ অশ্রুত ঝংকার,
শান্তি ক্ষান্তি কোথা তার—
দ্বন্দ্বআবর্তিত দ্রুত ধাবমান মানবসমাজ
দিগ্‌বিদিকে।

উদাসীন বসে আছি আজ

এইটুকু বুঝে—
আমার এ অস্তিত্বের কোনোখানে কোনো অর্থ খুঁজে
পাব না। কেবল অন্ধ অভ্যাসেই আরও কিছুকাল
অনর্থক শব্দ গেঁথে সেই শব্দজাল
নিক্ষেপিব সকাল বিকাল
সীমাহীন সমুদ্রের বুকে,
সযত্ন-সংগ্রহ-করা উপলে ঝিনুকে
ইন্দ্রধনুবর্ণের বাহার
নেহারিয়া উপবাসী প্রাণের আমার
মিটাইব ক্ষুধা
মিথ্যাভানে। 'নিরবধি কাল আর বিপুল বসুধা'
তবু লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হবে না কখনো।

নানা ছন্দে নানাবর্ণ শব্দসূত্র বোনো
ওরে মন, উপল ঝিনুক যাহা-কিছু টেনে আনো
তোমারই শব্দের ছাপ তাহাতে বাখানো
মুগ্ধমতি ; স্পর্শমণি তবু
মিলে না তো কভু।
আকাশের, অরণ্যের, নীল
যে বিহঙ্গ হায় গো নিখিল
রহস্যের নির্বাক্ উত্তর
বন্দী হয়ে বাঁধিল না ঘর
প্রাণের নিভৃতে ;
রাগদ্বেষ বাসনাবেদনাশঙ্কা দ্বন্দ্বাকুল চিতে
অবাঞ্ছিত আগন্তুকদল
নিত্যনব করি কোলাহল
করে আনাগোনা।
এরই লাগি নিরবধি শব্দজাল বোনা
নানা বর্ণে নানা ছন্দে এত যত্ন করি।

দুঃখে হাসি পায়, মরি,
আমার এ বিষাদের বিরাগের গান
শ্রুতিসুখশব্দনিখচিত সুবিহিতলয়তান
যেন কোন্ নিপুণঅপ্সরী
আজও দেখি নৃত্য করি
বিমোহিতে চায় গৌড়জনে—
বস্তুতঃ ভ্রষ্টা সে বাণী মোহে ক্ষণে ক্ষণে
আপন স্রষ্টারে।

কী গূঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছ আমারে
হে পৃথিবী? মুক্তি দাও দয়াময়ী! তব ধূলিতলে
ধূলা হয়ে রব কোনো ছলে
অবশিষ্ট এই তো কামনা—
আর জাগিব না কভু, আর যে গাব না
এ লোকে বা লোকান্তরে আলোকের স্তুতি, জয়গান
জীবনের। নিরন্ত নির্বাণ
একমাত্র কামনা আমার
নিঃসীম আঁধার।

ঝাঝা
১৮ পৌষ ১৩৪৫

পৌষ-পৃথিবী

হে পৃথিবী, আজ পউষের
আপাণ্ডুর শূন্যে হেরি আমারই মনের
শূন্যতার ছবি।
তুমিও কি শুষ্কতৃণ প্রান্তরসীমান্তে
রক্তবর্ণ রুক্ষ গিরিচূড়ে
বিশীর্ণ ধারার ধারে বালুকাসৈকতে
এইমত বসে আছ শূন্য দৃষ্টি রাখি

দূর শূন্যতলে ?
তব অধিষ্ঠানভূমি এ জড়পিণ্ডের
রবিপরিক্রমাপথে নিঃশব্দ যাত্রার
সেথা কোনো চিহ্ন নাই।
তা বলে কি তাহাদেরও এ ধূলায় চিহ্ন নাই, দেবী,
অগণিত সন্তান তোমার
যুগে যুগে যারা চলে গেছে
জীবপ্রভাতের আনন্দউৎসুক পদক্ষেপ
অবশেষে ক্লান্ত অবসাদে
কোনোক্রমে
অন্তিম মৃত্যুতে টেনে টেনে

অজ্ঞানতমিস্র দীর্ণ করি
স্বল্পসংখ্য যে কয়টি প্রাণ
অস্তোদয়-পরপারে অতারক অসূর্য আলোকে
যুগে যুগে জেগেছিল বলি
এ ধূলার হর্ষহুলুধ্বনি
ত্রিদশদেবতাবৃন্দে করেছে চকিত
বারম্বার—
বিস্মৃত তাদেরও পুণ্য পদচিহ্নগুলি ?

ভবিষ্যসমাজ আজ নাই।
আজ যারা অতিশয় আছে আর অস্তিত্ব যাদের
মৃত্যু হতে নিষ্ঠুর নির্মম
তাদেরও রোদনহাস্যশেষে
নির্বাপিত চিতাভস্ম মুঠা মুঠা লয়ে
দিগ্‌বিদিকে ছিটাইয়া কে কহিবে হায়
'মধু জল, মধু স্থল, মধুময় অনল অনিল'
শূন্য উপহাসে ?
ভস্মেরও যে রবে না ঠিকানা।

তবে কেন জীবের জীবন ?
আলোঅন্ধকার-উদ্‌বেলিত দিবানিশা ?
অরণ্যের শ্যামলিমা ?
অম্বরের নীল ?
এ অনন্ত আয়োজন
সীমাশূন্য দেশকাল ব্যেপে ?

হে পৃথিবী, আজ পউষের
আপাণ্ডুর শূন্যে হেরি আমারই মনের
শূন্যতার ছবি !
মধ্যাহ্নের রৌদ্রধূধূ দূর শূন্যতলে
শূন্য দৃষ্টি মেলে
তুমিও নির্লিপ্ত, একা,
বসে আছ বুঝি ?

১৮ পৌষ ১৩৪৫

কল্পনা

সত্য শুধু অলীক কল্পনা।
বাস্তব ভুবন, ক্ষুৎপিপাসা, হর্ষশোক,
জয় কিম্বা পরাজয়, কিছু সত্য নয়।
নিরুপাধি জীবনমৃত্যুরে
অথবা যে অনাদ্যন্ত কালে উদ্ভব বিলয় তার,
আপনি যে আপনার চিহ্ন লোপ করে,
নিরাকার,
মূর্তি দাও মতি দাও
কল্পনার বলে :
হিমগিরিসন্নিভ সে দেহ
দিগম্বর আবরে কেবল,
সূর্য শশী নক্ষত্রেরা জ্বলে
নয়নে ললাটে,

দিগ্‌বিদিকে বিলম্বিত নীল জটাজূটে
জীবপ্রবাহিণী গঙ্গা
লুকোচুরি মেলি
নানা ছন্দে বহে সদা
কলোচ্ছল আকুল সংগীতে,
ফণাধর নাগের ভূষণ অঙ্গ ধরে,
ববম্‌ ববম্‌ বাজে গাল,
ডমরুমন্দ্রিত কভু তাণ্ডবে বিশাল
বিনাশউজ্জ্বল হায় এ বিশ্বসংসার
চূর্ণ চূর্ণ বিকীর্ণ নিমেষে,
ধ্যানস্তব্ধ ত্রিনয়ন—
কখনো আবার
অট্টহাস্য নীলকণ্ঠ হতে
নির্বারিতস্রোত।

সত্য এই মোহন কল্পনা
চিরস্থির চিরজীবী।
অনড় কঠিন
এ বাস্তব সত্য নয়;
সত্য নয় ক্ষুৎপিপাসা
হর্ষশোক জয়পরাজয়
আজ আছে কাল যাহা নাই।

১৮ পৌষ ১৩৪৫

কল্পিত প্রেমের গান

কল্পনা সে সত্য হল বাস্তবের চেয়ে?
তবে গাই গান
কল্পিত প্রেমের
সুখের, দুখের।

এ বুকের অন্ধকারে
ঢাকা যা রয়েছে
ঢাকা থাক্।
ওগো বন্ধু, কে তুমি, কে আমি,
একবার ভুলে যাই—
গান গাই কল্পিত প্রেমের সুখের, দুখের

সেই গানে অবাস্তব সুখ
যত ক্ষণস্থায়ী হোক
লভে যদি কোনো মুগ্ধ প্রাণ
কোনো কালে,
তবে একবার
ওগো বন্ধু, কে তুমি, কে আমি,
সব ভুলে যাই—
গান গাই কল্পিত প্রেমের সুখের, দুখের

ঝাঁঝা
১৮ পৌষ ১৩৪৫

পূর্ণিমা

নিঃশব্দে ডেকেছে বান স্বপ্নপারাবারে।
সম্পূর্ণ উঠোন ভরে গেছে।
খালি টব চৌবাচ্ছার পাড়ে।
এ ধারেও অর্ধভগ্ন আরাম-কেদারা,
শূন্য উৎসঙ্গ যে তার,
পাদলগ্ন ছায়া লয়ে ভাবে
মুমুক্ষু ধেয়ানে :
নির্বিকার বিদেহ আত্মার
নিষ্কল স্বরূপ
ভাতিবে অচিরে।

কে জানে এখনি কোন্ দ্রুতগামী ট্রেন
উত্তরিল স্বর্ণবাহু শোনের কিনারে ?
নিষ্পলক নয়নের দ্যুতি
পূর্ণিমার মগ্ন এ আলোকে।
বহুকক্ষবিভক্ত জঠরে
নিদ্রাতুর যাত্রিকজনতা।
শীতল সাসিতে লগ্নভাল
কিশোর কি জেগে আছে কেউ ?
গম্ভীর মন্থর ধ্বনি শুনে
নিম্নে ওই সীমাশূন্য সৈকতে সলিলে
ভেদ খোঁজে বৃথা।
চলে ট্রেন শৃঙ্খলিত ঝড়ের আবেগে,
সীমাহীন প্রান্তরের বুকে
চঞ্চল চকিত ছায়া আকর্ষণ ক'রে।
নিরন্তর ওঠে ঝলি
সম্মুখে সর্পিল লৌহ পথ ;
ছুটে এসে পিছে প'ড়ে যায়
রক্ত ও সবুজ বর্ণে উদ্যত নিশানা
পর পর।—
কাননবিষ্ট কোন্ কৃষকের গ্রাম ;
দীর্ঘিকা সুন্দর ,
অহেতুক-বিদ্যুৎ-উদ্ভাসিত
সুপ্ত শহরের ছবি ,
অতঃপর, অবশ্য, স্টেশন—
উচ্চকিত কলরব,
ব্যাকুলতা ;
ওঠা আর নামা ;
অবশেষে গার্ডের লণ্ঠনে সবুজের ছটা।
আবার প্রান্তর ; দূরে দূরে
বন উপবন আর পর্বত -মেখলা

ধরিত্রীর স্বপ্নমূর্তি।
দুর্ভেদ্য জঙ্গল একি কভু ফুরাবে না!
অনাম ওষধিগুল্ম;
লতাজালবেষ্টিত বিটপী;
অযুত নিযুত ছিদ্র দিয়ে
বিগলিত এই জ্যোৎস্নারাশি।
সুগভীর-নৈঃশব্দ্য-আশ্রিত
দোয়েল কোয়েল শ্যামা
সুপ্ত ডালে ডালে;
নিম্নে ফেরে গম্ভীর গহনে
শৃগাল শার্দূল
দীপ্তচক্ষু
সুচতুরগতি।

এ মুহূর্তে কোথা কোন্ ট্রেন
ফল্গুর কিনার ঘেঁষে গেল?
অক্ষুণ্ণ শান্তির বুকে অস্থির অধীর ঝঞ্ঝা হেনে
শূন্য কুরুক্ষেত্রে এসে বুঝি স্তব্ধ হল?
প্রচারিল আর্ত বংশীস্বর চতুর্দিকে!

মধ্যাকাশে কলঙ্কী হে চাঁদ,
একখানি অকলঙ্ক অসীম হাসিতে
অর্দ্ধধরা ছেয়েছ যখন,
পথে পথে মুখর কুক্কুর,
তস্কর, পাহারাওলা,
রোগী ভোগী রুদ্ধ ঘরে ঘরে,
এ-সকল ছাড়া
বলো, চাঁদ, কে জাগে কোথায়?
আকুল-সুগন্ধ-ঝরা
হিমঝুরি-বীথিকায় কবি জেগে আছে

কঙ্করকণ্টকশিহরিত খোয়াইএর ধারে ?
কে জাগে ? কৈলাসে
হিমাচ্ছন্ন অচ্ছোদের তটে
দিগম্বর সে বুঝি সন্ন্যাসী ?
সে কি শিব ?—
শূন্য হতে ঝরে
বিস্তৃত তুষারে একাকার
নির্বিচল স্থির শুভ্র অঙ্গে অঙ্গে তার
তোমারই কৃতার্থ কর—
শুভ্র ! শুভ্র ! অন্তহীন শুভ্রতা কেবল
দশ দিক ভ'রে।

২১ পৌষ ১৩৪৫

পল্লীস্বপ্ন

অতিদূর নারিকেল-সুপারির বনে
বুঝি এতখনে
গভীর-গহন-নীর সরসীর তীরে
শৈবালে শাদ্বলে মেলি ধীরে ধীরে
অপরূপ মায়াখানি, শ্যাম ছায়াখানি,
বিকালের বেলা নেমেছে রে।
অশ্রুত মূলতানে কেঁদে কেঁদে ফেরে
কে জানে গো কোন্ হৃদয়ের
সুখ না সে দুখ !
সোনার বিকাল বেলা, হেরো উন্মুখ,
অনিমেষ দু নয়নে তারই
সুগভীর আকাশের স্থির নীলিমারই
নিঃসীম কথা !
বাহু নয়, চঞ্চল আলোকের লতা—
আ মরি, মধুর মৃদু সেকি চপলতা—
হিরণকিরণময় দশ অঙ্গুলি

ধূলি আর তৃণগুলি
ছুঁয়ে লীলা করে অকারণ!
দূরে যেথা নারিকেল-সুপারির বন!

বিকালের বেলা সুন্দর!
ঘাট আর ঘর
মিলালো যে পথখানি তারই হৃদি-'পর
আজও বধূ করে আনাগোনা?
অঙ্গে আঁচলে কেশে ঝ'রে পড়ে সোনা
নীরব উর্ধ্ব হতে
নির্জন বনপথে
আজও নারিকেল-সুপারির?

নয়নের নীর ভরে যায় দু'নয়নকূলে।
ধূমে আর ধূলায় আকুলে
গূঢ়হাহাকারমূঢ় মুখরিত এই রাজধানী।
অমূলক কল্পনাখানি
দূরে নাই নারিকেল-সুপারির বন;
বিকালের-আলো-হীন বিদায়লগন
আজ দিবসের।
ভারে নত ভরা কলসের
বধূ ধীরে ধীরে
ঘাট হতে ঘরে নাহি ফিরে
সহসা থমকি গতিছন্দে
কোথা সে প্রথমচূতমঞ্জরীগন্ধে
ক্ষণউন্মন।

অমূল স্বপন
বিকালের বেলা আর নারিকেল-সুপারির বন।

পৌষ ১৩৪৫

নীল ফুল

এই তৃণে এই ফুল ফোটে সুনীল-বরন।
অলক্ষ্য মধুকর জোটে; চপলচরণ
প্রজাপতি চমকিয়া যায় হেম ডানা নেড়ে।
কে দেখেছে কে দেখে নি হায়! হাট থেকে ফেরে
বেণুবনে-ঢাকা গ্রাম-পানে গ্রামবাসী লোক।
পায়ে-আঁকা পথ'মাঝখানে প্রাণের আলোক
তৃণের ডগায় বিকীরিয়া ফোটে এ কুসুম;
গান গায় ফিরিয়া ফিরিয়া, দেয় শত চুম
বিমোহিত একটি মধুপ।

হায় গো, নিখিল
নীলাকাশ (একি অপরূপ) এই এক-তিল
ফুলের ভিতর ওঠে ভরি। আছে এই ফুল।
দূরে নাই নগর নগরী। মনে হয় ভুল
স্বপ্নবিকার সেই-সব যন্ত্রমুখর
দিন রাত, প্রাণপরাভব। পথহৃদি-'পর
যুগে যুগে এই তৃণধূল, এই নীল ফুল।

২৭ পৌষ ১৩৪৫

কুমুদবতীর ঘাট

প্রান্তরপথধারে
নিরালা, নিবিড় শাল-তাল-সহকারে,
কুমুদবতী এ দীঘির ভগ্ন ঘাটে,
যখন সারাটি মাঠে
সমুখ-জ্যোৎস্না নেমেছিল কবে চতুর্দশীর রাতে,
যেতে যেতে নব বর নববধূ-সাথে
শ্রান্ত শিবিকাখানি

থামালো বারেক : সোপানের শেষে ক্ষণতরে কল্যাণী
চন্দনচর্চিতা
দাঁড়ালো রে বধূ নির্বাক্‌বিস্মিতা।

ফুল নয়, ভুল হয় রে স্বপন বলি—
সিত জ্যোৎস্নায় সিত কুমুদের কলি
ফুটেছিল শত শত।
সম্ভ্রমে সুখে, দুটি আঁখি সন্নত
অনিমেষ দিঠি তাই তারই পানে তুলেছিল একবার—
পার হয়ে এসে মৌনের পারাবার
খনে খনে বুঝি মূর্ছে মলয় কাননের মর্মরে ;
কূজিছে কোকিল ; স্মিত শুভ্রতা-থরে
ভ'রে দিল বর নবোঢ়ার অঞ্জলি
বিকচ কুমুদকলি
ল'য়ে দীঘিজল হতে।

প্রান্তরবাহী দীর্ঘ বিজন পথে
কখন্ যে কোন্ দূর পল্লীর যাত্রীতে পথ হাঁটে ;
কুমুদবতীর ঘাটে
তৃষাহারী পিয়ে স্বচ্ছ শীতল জল।
প্রাচীন দীঘির ভগ্ন সোপান, বল্,
সমুখ-জ্যোৎস্না রাতে
কবে নববধূ নবীন বরের সাথে
হেথায় দাঁড়ালো এসে।
ভগ্নমৃণাল ভ্রষ্টকুমুদ চ্যুতসিন্দূররেশে-
রঞ্জিত ধরাতল
যে কাহিনী ঘোষে সব কথা তার বল্।

ঝাঝা
২৮ পৌষ ১৩৪৫

গানে গানে

ব্যথা হায় ব্যথা নাহি রয়
যখনি ঝংকৃত হয়
বাগ্‌দেবীর বীণাতন্ত্রীময়।
সুনিভৃত সুখ
হৃদয়ে যা একটুক
স্থির হয়ে বসেছিল কবে,
সঙ্গীতের ভবে
চমৎকার প্রজাপতি-হেন
চমকিয়া ফেরে— তারে যেন
চিনি না, জানি না।

বাণী গো, তোমার বীণা
সুরে সুরে অপরূপ একি মরীচিকা
আমার ভুবন ভরি সৃজে—
নৃত্যশীল শিখা
যত দগ্ধ করে প্রাণ
তত ভালোবাসি আর তত গাই গান।

ঝাঁঝা
২৮ পৌষ ১৩৪৫

গান

যূথীমুকুলের গন্ধে ভিজে বায়ু সেধে যায়
আজি আষাঢ়ের বারি-ধারাতুর সন্ধ্যায়। মরি হায়!
গান গেঁথেছি তাহারই ছন্দে
দুখ'- মিশ্রিত কী আনন্দে!
আন জনমের বন্ধুর বাহুবন্ধে
উতলা চিত্ত ধায়
এই বিরহবিধুর সন্ধ্যায়। মরি হায়!
আজি ঝর্ঝরধারে মৃদুমর্মরগান
খনে শুরু খনে অবসান
বিহ্বল বনবীথিকায়। মরি হায়!
পুন ঝিল্লির ঝিনিঝিনি
শুন কাঁদায় বিজন এ যামিনী।
তমালতালীর শিরে শিরে মায়াবিনী
খদ্যোতদ্যুতি চমকায়
চির মিলনোৎসুক প্রাগৃষায়। মরি হায়!

কলিকাতা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

মেঘমায়া

এমনি মেঘের মায়া
দলিতাঞ্জনঅবলেপে
যেদিন আষাঢ়ে দূরদিগন্ত ব্যেপে
কী লিপি লিখিতে ব'সে মুছে বার বার,
বঞ্চিত হৃদয়ের দীর্ঘনিশ্বাস বুঝি কার
ছুঁয়ে যায় বিরহী এ হিয়া,
মনে হয় বুঝি মোর প্রিয়া
আমারই লাগিয়া চিরতরে
দীর্ঘসরণীশেষে অচেনা অজানা কোন্ ঘরে

দিবস গণনা করে
ঋতুর ঋতুর ফুলদলে—
এমনি মেঘের মায়া
যবে দূরদিগন্ততলে
অশ্রুআভাসে ছলোছলে,
খনে থির খনে চঞ্চলে
নারিকেল-গুবাকের কায়া।

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

অভিসার

নিশঙ্ক দীপ জ্বালি
একটি বকুলমালায় ভরিয়া একটি অর্ঘ্যডালি
তন্দ্রানিবিড় নীরব নিশীথে মহুল-তমাল-তালী-
কাননে যে পথে গিয়েছিনু বারে বারে
বন্ধুর অভিসারে
সে পথ আজি কি ঢেকেছে নবীন তৃণে?
তেমনি বিজন বিপিনে প্রথম দিনে
আজি আষাঢ়ের, বারি ঝর্ঝর ঝরে
তৃণ-'পরে, তরু-'পরে,
নবকদম্বথরে?—
'নেভা প্রদীপের আলো
ফিরে জ্বালো! ফিরে জ্বালো'
ঝিল্লিরা কাঁদে প্রান্তরে কান্তারে
দীপ জ্বালি যেথা নিশঙ্ক হৃদি গিয়েছিল বারে বারে
বন্ধুর অভিসারে!

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

রজনীগন্ধা

একাকী নিঃসঙ্গ ঘরে
দৃষ্টি রাখি দূর দিগন্তরে

মনে মনে ভাবি

শ্রাবণের অশ্রুজলে পূরে
কোথা কোন্ দূরে
একটি অতুল
নবপ্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার ফুল
কাঁপে থরোথরে
শ্যামদণ্ডশীর্ষ-'পরে
বিহ্বল আবেগে!

ঘনায়িত মেঘে আরও মেঘে
বর্ষা আসে নাবি।
একা বসে ভাবি

কাঁদে কোন্ কাননের কোণে,
কুটীরঅঙ্গনে,
বুঝি রিক্ত বাসরের রুদ্ধ বাতায়নে
কর হানি! বুঝিবে কেমনে
কেন কাঁদে কী বিরহে,
কোন্ কান্তমিলনের সাধে
কার কান্না! তবু তারই স্রোতে
হৃদয়ে সঞ্চিত নাহি হতে
মধু, হায়,
ধুয়ে মুছে যায়।

আজ ভাবি
সে রজনীগন্ধাটি কোথায়!

কলিকাতা
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

নীরঞ্জনা

আজি আলো ঝলোমলো করে
অকারণে মোর অন্তরে অন্তরে।
সুর'সুরধুনীস্রোতে
ভেসে আসে কোথা হতে
নির্মাল্যের ফুলউপহার
মল্লীমালতীথরে।
আলো ঝলোমলো করে
চঞ্চল বীচিভঙ্গে
রঙ্গে
অন্তরে অন্তরে।

হে অভিসারিণী ধারা,
বিষ্ণুচরণসরোজস্রুত,
শিবজটাজূটে-হারা,
তাণ্ডবউৎসবে
গুরুগম্ভীর কম্বু ডমরুর রবে
কলকল্লোল মিলায়ে কি মণি-ভূষণ ফণীর সনে
মেতেছিলে নর্তনে—
বিসারিত জটাতমিস্রে লীন ইন্দু তপন তারা!
হে উন্মাদিনী ধারা!

আনন্দময় নন্দনউপকূলে
যেথা অমলিন মন্দার ফুলে ফুলে
চিরমলয়জ বয়,
প্রাচী দিগ্‌ভাল স্থিরপ্রভাতের সুস্মিতপ্রভা-ময়,
সুরবালিকারা অর্ঘ্য ভাসায় জলে,
অপ্সরাবধূ সন্তরে কুতূহলে
কাঞ্চনতনুবিভায় হায় রে খিদ্যুৎ শত হানি,

কুলু-কুলু-কুলু বাণী,
কল'কলরব তুলে
চিরপ্রবাহিণী বহ আনন্দে
নন্দনউপকূলে।

অয়ি চিন্ময়ী ধারা,
তোরে ভালোবেসে মর্তে এসে গো
আজি যে আত্মহারা
এই মৃণ্ময় ঘাটে
মন্দির রচি আমার দিবস কাটে।
ভঙ্গুর তট, ভঙ্গুর দেবালয়—
সদা মনে জাগে ভয়।
আঁধারে-আলোয়-শতেক-ছলনা-ময়
কত রূপে মোরে ভুলাও রে মায়াবিনী,
অস্থির রাতিদিনই
জোয়ার-ভাঁটায়।··· কভু হায় নিরাকারা
সুর'সুরধুনীধারা!

ও চিরপ্রবাহে তুলে
ভাসায়ে লও-না, কত আর উপকূলে
গণি গো লহরীমালা!
বিষাদ-আঁধার-ঢালা
অমাবস্যার রাতি
তাও তো কেটেছে সুখের-দুখের-সাথি,
ভূলোকে দ্যুলোক ভুলে।
কেন হায় উন্‌মূলে
নিরন্ত স্রোতে আমায় নিলে না তুলে!

আলো ঝলোমলো করে
অকারণে আজ অন্তরে অন্তরে।

সুর'সুরধুনীস্রোতে
ভেসে আসে কোথা হতে
নির্মাল্যের ফুলউপহার
মল্লীমালতীথরে।
আলো ঝল্‌মল্‌ করে
চঞ্চলবীচিভঙ্গে
রঙ্গে
অন্তরে অন্তরে।

কলিকাতা
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

কেকা

আকুল কেকায় কেন ডেকে ওঠ ঐ
থেকে থেকে হে ময়ূর? সে আকাশ কৈ
কদম্ববনশিরে
নবীন নীরদে ঘিরে?
কালো কালিন্দীনীরে করতালি তাথৈ তাথৈ—
হে ময়ূর, সে গোকুল কৈ?

হেরো এ পাষাণকায়া
নগরীর নাই মায়া নাই।
বন্দী করেছে তোরে,
বন্দী করেছে মোরে ভাই!
হোথা অলিন্দ থেকে
ব্যাকুল কেকায় ডেকে
কেন এ প্রশ্ন হানো বৃথাই বৃথাই?

পালখে পালখে তোর যে চিত্রকর
পুলক আঁকিল, ওরে, এই পিঞ্জর
সে তো রচে নাই— যেথা শৈলশিখর

কূটজফুল্ল আজি,
নবীন শস্পরাজি
গুরুগুরু গম্ভীর রবে শিহরায়,
দিয়েছিল রে তোমায় নৃত্যআসর।
এ নগর এ যন্ত্রযান-ঘর্ঘর
কে রচিল নিষ্ঠুর এই পিঞ্জর ?

আকুল কেকায় কেন ডেকে ওঠ ঐ
থেকে থেকে হে ময়ূর ? সে আকাশ কৈ
যেথা মাথা কুটে মরে
কালবৈশাখী ঝড়ে অরণ্য ? থিয়া থৈ থৈ
তরঙ্গদল নাচে— সে যমুনা কৈ ?

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

গান

তুমি চরণে নূপুর পরিয়া
দলি মালতী বকুল পড়ে যা ঝরিয়া ঝরিয়া
আজি এ পূবালি পবনে
আসিবে না জানি এ পুরীপ্রান্তে
পথ দেখাবারে এ দিগ্‌ভ্রান্তে,
হাতে ধ'রে ওরে নিয়ে যেতে তব
সোহাগস্নিগ্ধ ভবনে
আজি এ পূবালি পবনে।

তুমি একটি প্রদীপ জ্বালিয়া
কভু নিশিঘোর প্রাণে কনকপ্রবাহ ঢালিয়া
জানি আসিবে না বালিকা !
বুকে তুলে নিয়ে এ বীণাযন্ত্রে
ঝনন রনন মৌনী তন্ত্রে

স্বরের প্রসূন ফুটায়ে ফুটায়ে
গাঁথিবে না প্রেমমালিকা—
জানি, আসিবে না বালিকা !

কলিকাতা
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

যূথী

স্নিগ্ধধূসর মেঘে
অচপল আলেখ্যে-আঁকা
নারিকেল সুপারির শাখা।
পুন হেরি কী আবেগে
চঞ্চল বায়ুবেগে,
সিন্ধুপারের লেগে
কাতরে কাঁদিয়া বলে :
দাও দাও পাখা !
মেদুর'গগনতলে
বায়ুবেগে সঞ্চলে
নারিকেল-সুপারির শাখা।

হেরো যূথীবল্লরী
দ্বিতলের বাতায়নতলে
শ্যামপল্লবে আর
শুভ্রবিথার ফুলদলে
সহাস্যসুন্দরী
উঠেছে গাহন করি
স্বর্লোকগঙ্গার জলে।
মুহুশিহরিত-দেহা,
নব সুখ, নব স্নেহা,
সৌরভছলে
শ্যামসুন্দর প্রিয়ে

কী কথা বলিতে গিয়ে
কী কথা যে বলে !
আমারই এ মরি মরি
বাতায়নতলে
ফুল্ল এ বল্লরী
শ্যাম পল্লবে আর
শুভ্রসজল ফুলদলে।

কলিকাতা
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

মায়াবিনী

মম গহনহৃদয়সঞ্চারিণী
কে গো—
হেন'- নূপুরে ক্বণিয়া রণিয়া
অশ্রুত রুনু-রুনুনু-রিনি
আমারে ভুলাও,
হৃদয় দুলাও,
স্বপন বুলাও
কে গো—
কে মায়াবিনী !

ওগো কে মায়াবিনী
কোন্ মোহঅঞ্জন নয়নে দিয়া
চির হৃদিরঞ্জন করেছ প্রিয়া,
ভুবনভবন
আলোকপবন—
বনউপবন
শোভে নীরব'স্তব' পুষ্পপুঞ্জ
পীযূষ'হিয়া।

ওই   ঊর্মিলা নদী তটে তটে রটে
     কী কিঙ্কিণী!
কেন 'চিনি চিনি' ক'রে তোরে না চিনি
     রে মায়াবিনী!

কে গো—

তুমি মাধুরীস্রোতে
মোর আঁধার বিষাদ বিরাগ ভাসাও
     খনে খনে যেন সে কোথা হতে!
কে গো—
সুধাসিঞ্চিত দিনযামিনী
সুদূর'হৃদয়'সঞ্চারিণী
অশ্রুতবেণুবীণাবাদিনী
কে গো—
কে মায়াবিনী!

কলিকাতা
৭ আষাঢ় ১৩৪৬

ঊষা

ধুয়ে দাও এ জীবন
সহাস্য নয়নের ওই ঊষাস্রোতে,
যেথা হতে
এ ভুবন শুকতারা-দীপ নেয় জ্বালি,
যামিনীর তারাফুলডালি
যার অভিসারে
ভেসে আসে বারে বারে
আপনারে হারাইবে ব'লে।

ওই পদপল্লব স্থাপি হৃদিতলে
তোমার উদয় হলে

মোর চিরশর্বরী হবে না কি শেষ ?
বাসনা বেদনা শত মোহের আবেশ
করো দূর !
ধুয়ে দাও এ জীবন আজ উষাস্রোতে
অনিমেষ দু নয়ন হতে।

জ্যোতির প্রতিমা অয়ি আনন্দময়ী,
হেন অকরুণা কেন !
সঞ্চিত কী আঁধার বহি
আলোকবিরহী !
অশেষ জীবন
অগণিত শত যুগ যাপিব এমন কত আর !
ধুয়ে দাও
মিলাও মিশাও
এ জীবন ওই উষাস্রোতে
অনিমেষ দু নয়ন হতে !

কলিকাতা
১১ আষাঢ় ১৩৪৬

বর্ষাপ্রভাত

নিশান্তের বৃষ্টি-অবসানে
দক্ষিণে ধূসরকান্ত
স্নিগ্ধশান্ত মেঘ'মাঝখানে
অকম্পিত নারিকেল আলোকের স্নানে
উর্ধ্বে তুলে শির।

কখন মিলায় আলো। অশ্রান্ত বৃষ্টির
দিগ্‌বিদিকে চিক নেমে আসে।
অশান্ত বাতাসে

নারিকেল-শীর্ষ ঘন দোলে
দিগ্‌বলয়কোলে।

কলিকাতা
২০ আষাঢ় ১৩৪৬

অকাল বৈশাখী

অকালে কালবৈশাখী ঝঞ্ঝা আসে
বাতাসে বাতাসে অট্টহাসে
প্রলয়ঙ্কর কী উল্লাসে
কাজল'জলদকেতন তুলে।

'কে এল' বলিয়া ভুল ক'রে ব্যথা ভুলে—
বিজননিলয়নিবাসিনী
নয়নলগ্ন কেশতমিস্র অপসারে বিরহিণী,
সুখশঙ্কিত বেজে ওঠে কিঙ্কিণী,
চকিতে হৃদয় তুলে।

কালোকালিন্দী-কূলে
আমার মনের মত্তময়ূর বুলে।
বিদ্যুৎগতি হেরো ঐ ঝড়ে
অরণ্যহৃদি উন্মাদ করে
নির্দয় দোল দেয় বেগভরে
আকুলিয়া হেমরোমাঞ্চময় কদম্বফুলে-ফুলে।

অকালে কালবৈশাখী ঝঞ্ঝা আসে
বাতাসে বাতাসে অট্টহাসে
প্রলয়ঙ্কর কী উল্লাসে
কাজল'জলদকেতন তুলে।

কলিকাতা
১১ শ্রাবণ ১৩৪৬

মগ্নতরী

মগ্নতরী যে নাবিক
উৎক্ষিপ্ত নিঃসঙ্গ তটে
মূর্ছাঅন্তে দিক্-
দেশকাল-পরিজ্ঞান-মূঢ়
নির্নিমিখ
নির্বাক্ বিস্ময়ে হেরে
ধূ ধূ
বালুবিস্তারের বুকে মূর্তিকল্প শুধু
অজ্ঞাত একক
কে আছে দাঁড়ায়ে
স্থাণু—
চন্দ্রমানক্ষত্রভানু-
বিভাস-বিশূন্য সন্ধিক্ষণে
দিনান্তে ?—
নিশান্তে ?—
হায়,
বুঝিবে কেমনে
কী যে নাম, কী যে ভাষা,
কৌতূহল ঘৃণা ভালোবাসা
কী দিয়ে ও দিবে সম্বর্ধনা,
মৃত্যুঘাত হানিবে কি,
ও কি অন্যমনা
ঔদাসীন্যে করিবে প্রয়াণ,
অথবা মূর্তিই বটে
মূর্তির সমান
লেগেছিল যারে—

কোনো কথা কহিবে না,

নড়িবে না, সরিবে না, হা রে,
পদতলে
মাথা কুটে মরিলেও বিন্দুমাত্র ছলে
কোথাও যে কেহ আছে
এ স্বীকৃতি দিবে না কখনো·

নৈঃসঙ্গ্যউৎক্ষিপ্ত কোনো
মগ্নতরী নাবিকের মতো
আপনারে মনে হয়
কর্মঅপগত
দিবাশেষে
এই বারান্দায় এই
কেদারায় এসে
বসি যবে—
ভাবনায় জ্ঞানে অনুভবে
দৈনন্দিন-অভ্যাস-উদ্ভূত
উচ্চতুচ্ছ যতকিছু সব সরে যায়,
আপনার-পদচিহ্ন-আঁকা পথ দিয়ে
আপনার পিছু
চলিতে চলিতে অকস্মাৎ
দেখা হয় আপনার সাথ :

কে বা আমি ?—
কে গো আমি ?—
নিরুত্তর এ জিজ্ঞাসা ওঠে দিবাযামী
অনাহত ধ্বনির সমান—
অচেতন
কে আমি অজ্ঞান ?

কলিকাতা
৯ শ্রাবণ ১৩৪৬

স্বপ্নশেষ

রবীন্দ্রনাথ :

আকাশনিমগ্ন এই ধরণীর ঘাটে
সুরের তরণী বেয়ে তরঙ্গের নাটে
স্বপ্নের উজান খরস্রোতে
ভেসে এসেছিনু দূর ভবিষ্যৎ হতে—
দূর, অতি দূর।······

তরঙ্গের সাথে
অভিসারী-তরঙ্গ-আঘাতে
গান হয়ে উচ্ছ্বসিল সুর,
নামহারা পরিচয়হীন অদৃশ্য বন্ধুর
রচিল আসনখানি শতলক্ষ-দলে-
বিকশিত দিব্যশতদলে
মুহূর্তের তরে। ·····

মুহূর্তঅন্তরে
কী মন্ত্র পড়িল জাদুকর,
তাই তারে অশীতি বৎসর
ব'লে ভ্রম হয়—
বাল্যজরা-হর্ষশোক-আশাশঙ্কা-ময়
অতি দীর্ঘ কাল।······

সেই গৃহ, এই সে সকাল,
যেখানে মর্তের মুগ্ধ আলো
মুহূর্তে বেসেছি আমি ভালো,
মুহূর্তে নিয়েছি টেনে হৃদয়ে আমার
এ বিশ্বসংসার।······

জীবনের চলচ্চিত্রমালা
শেষবার দেখা দেয় ছায়ারৌদ্র-ঢালা
স্বপ্নময় স্বরূপে তাহার।
দেখা দেয় শেষবার
তরণী ফেরার মুখে
আঁখির সম্মুখে
বিদ্যুতের গতি।......

দূরে, অতি
দূরান্তরে, পৃথিবীর নব নব দেশে
ফিরেছি পথিকবেশে
সত্য-শিব-সুন্দরের বাণীবহ দূত।
পুণ্যবেদী করিয়া প্রস্তুত
নিখিলমিলনযজ্ঞে নিখিলেরে ডাক
দিয়েছি। নির্বাক্
ভীরুরে দিয়েছি ভাষা। জন্মকাল হতে
যারা অন্ধ সেজেছিল, অপূর্ব আলোতে
মেলেছে নয়ন।......

নিঃসঙ্গ যখন
কেটেছে দিবস রাত্রি, উদার আকাশে
শুকতারা, সন্ধ্যাতারা; তারই প্রতিভা সে
মৃদুমন্দকলকলে-
প্রবাহিত শান্ত নদীজলে।.... ..

একমুষ্টি মল্লিকামুকুল
সুগন্ধি বকুল
উত্তরীয়প্রান্তে বেঁধে
অধরা অধরস্পর্শ সেধে
উতলা কৈশোর।......

বাল্যকাল মোর
স্বর্ণপিঞ্জরের বন্দী, সবুজের নীলের গহনে
বনের পাখিরে হেরি আপনার মনে
বিষাদবিধুর, বোবা হরষে চকিত।......

ক্ষণমাত্র হয়েছে প্রতীত
অশীতিবর্ষের এ জীবন : নামে রূপে
পরিচয়ে রয়েছে আবৃত।......

চুপে চুপে
নাম রূপ দেশ কাল -রচিত নির্মোকে
অন্তরে মোচন করি অন্তরআলোকে
মোহমুক্ত চোখে
আপনারে হেরিলাম এই
অপূর্ব নূতন : নেই
নাম রূপ পরিচয় তার ; মুহূর্তেই
মর্তধূলি ছুঁয়েছিল, মুহূর্তেক-পরে
আবার ফিরিল ঘরে।......

চিরদূর রহস্যের স্বপ্ন ছোঁয় ব'লে
ধরণীর ধূলি— তৃণেতে কুসুম দোলে,
জড় পায় প্রাণ,
আকাশ আলোক বায়ু গেয়ে ওঠে গান,
অমৃত অপরিমাণ
ভরি দেয় পরিমিত এ মরজীবন।......

হে পূষন্,
উজ্জ্বলন জ্যোতির্লোকে করো উদ্ঘাটন
হিরণ্ময় দ্বার।
স্বপ্নশেষ যাত্রাশেষ হয়েছে আমার।

সে পুরুষ হেরিতেছি আমি
আমারই অন্তরে, যিনি তব অন্তর্যামী।

বোলপুর
১ ভাদ্র ১৩৪৮

নগরসংগীত

সর্পিল সার্থকনাম গলি
সার্কুলার রোড ছেড়ে যায় নি যে চলি
এঁকেবেঁকে কোনো স্বপ্নসমুদ্রের পারে।
তবু কেন ভালো লাগে তারে :
ছোটো বড়ো
দু ধারে প্রহরী বাড়ি যেন
(দ্বিতল, ত্রিতল, কদাচিৎ
কাঁচা-পাকা-ভিত
খোলা-দিয়ে-ছাওয়া)
পথরোধ করে তাই দক্ষিণের হাওয়া
ফিরে যায় অন্তরিত দূর সন্ধ্যাকাশে
চৈত্রে বা ফাল্গুনে ;
ত্রস্ত পাড়া
পাসের পড়ার শব্দ শুনে ;
পাকায়ে পাকায়ে ওঠে ধোঁওয়া ;
কোথাও উৎখাত মাটি-খোওয়া
পদতলে বাজে—
কোথাও বেয়ালা ;
কেরানির শিশুর দেয়ালা
বারান্দার শানে ;
কোনোখানে
প্রাচীন অশ্বত্থতরুতল ;
অচল অটল

সিন্দুরবিলিপ্ত শিলাখানি ;
প্রসারিত করব্যূহে আলোকের বাণী-
সঞ্চয়আগ্রহ অনুক্ষণ
বিটপীর,
উর্ধ্বে অধে তাই তো এমন
চমকে অস্থির
উজ্জ্বল অরুণ কিশলয়ে প্রাণউৎফুল্লতা ;
অর্ধমুক্ত
দরোজা জানালা কত কথা
জানাতে যে চায়—
তায়
বালকের কোলাহল,
ছপ্‌-ছপ্‌ ছল্‌-ছল্‌
স্নানঘরে, সিঁড়ির মাথায়
সচকিত দুটি পায়
শাড়ি লাল-পাড়,
কথা দুই-চার ;
অকস্মাৎ আরামউদ্যান ;
মুক্তস্রোত জনতা ও যান
এস্‌প্ল্যানেড-আবর্তের মুখে ;
উন্মাদ আবেগ 'চলো চলো' ;
দোকানে দোকানে ঝলোমলো
পণ্য ; আর
বৈদ্যুতিক আলোর বাহার
চতুর্দিকে।

মনে থাকে শহরের এই সন্ধ্যাটিকে—
অজ্ঞাত ঘরের কোণে
কোনো বালা-চুড়ির নিক্কণে,
বুঝি পথভিক্ষুকের মুখের ছবিতে।

দেখো, রাস-বিহারী বীথিতে
শ্যামঝুরি সোনাঝুরি মিলে
কী যে সুর এনে দিলে
সৌন্দর্যে উদাস দূর পশ্চিমের পানে
প্রাণ আমার জানে,
আর জানে শ্রাবণের বর্ষণউন্মুখ
স্তব্ধ মেঘভার
শিয়রে তাদের।···

সুখ,
অযুত নিযুত গৃহ আছে
তার কোন্ ঘরে
আমার অপেক্ষা করে
একটু আঁচল টেনে সীমন্তসীমায়
গুন্ গুন্ সাহানায়
মোহমন্ত্র পড়ি,
হরি হরি,
সে কথা তো রেডিয়ো না বলে
তারস্বরে।
পরিচিত পানসত্রে তবু চা'র পাত্রেতে উথলে
সুখ এতটুক ; আমি
ভাবিনী চুমুক
দিতে দিতে দেখি—
ঘাস উঠেছে কি
মাঝপথে,
শিশ দেওয়া শব্দে ট্রাম ধায়,
ধায় শতে শতে
লোক শুধু লোক
নিয়তবিচিত্র ছায়ালোক
প্রাণে মোর মেলে—
ওই বৃদ্ধ, ও রূপসী, ও কিশোর ছেলে,

ওরা সকলেই
চিরপরিচিত মোর, আজ চেনা নেই
বিশ্বসুদ্ধ যাদুমুগ্ধ ব'লে।

আয় রে শ্রাবণ, আয় চলে
ইট-কাঠ-লৌহের জঙ্গলে
আজ এ শহরে।
প্রাণে সাধ আছে তোর তরে
বেঁধে দেব গান।
আকণ্ঠ করিব আমি পান
জনতাজীবনস্থরা
(বুক জ্ব'লে যাক্)
বসন্তে উৎফুল্ল কৃষ্ণচূড়া-
রাগে রঞ্জি', বিরহী বকুল
চাঁপা ফুল
-গন্ধরজে সুরভিয়া বাদলের রাতে,
শরৎপ্রভাতে
অপলক মুগ্ধ আঁখিপাতে
শহরের সুপ্তিঊর্ধ্বদেশে
যে শুক্র নীরবে চায় হেসে
তারে চেয়ে, তারে ভালোবেসে,
নির্বৃত অন্তরে তারই ছবি,
আমি এক কবি।

কলিকাতা
১৩ শ্রাবণ ১৩৪৬

স্বর্গ-মর্ত

মর্ত আর স্বর্গভূমি
বক্ষে তুমি বালা!
দীপহীন এ নিভৃতে
দীপ তুমি ; অতন্দ্র প্রণয়ে
স্বপনকৌমুদীরাশি ঢালা।
মরীচিকাছলনায়
চিরদূর আহ্বানের পালা
শেষ ক'রে এলে যে কখন্
বক্ষে তুমি বালা।

২৩ কার্তিক ১৩৪৬

স্বপ্নসীমন্তিনী

স্বপনের প্রান্ত ছুঁয়ে থাকো ;
তুমি মোর ঘরে এসো নাকো
সীমন্তে অঞ্চলটুকু টেনে...
কাছে এনে
ধরিলে, যাহার স্রস্ত আবেষ্টন হতে
মুক্ত হয়ে পড়ে নেত্রপথে
নির্মেঘ পূর্ণিমা।...

তবু কতক্ষণ
মূঢ় মন মুগ্ধ দু নয়ন
তারে বোঝে
তারে খোঁজে।...

দূর স্বপ্নসীমাটুকু চুমি
থাকো তুমি প্রিয়ে!

৮ ভাদ্র ১৩৪৬

রহস্যময়ী

আত্মার রহস্যঘন নিঃসীম আঁধারে
আত্মা খোঁজে কারে ?
সে কি তুমি !
অধরের প্রান্তে মুকুলিত,
চিবুকচুম্বিত,
অতল নয়নহ্রদে লীন,
নিত্যই নবীন
শুভ্র হাসি তাই কি রমণী !···
রুদ্ধশ্বাসে গণি
পল
অনুপল।

আলো ছিলে ; কখন্ কেবল
আলো হবে ফের,
এ বিশ্বের অনন্ত মূরতি !

আপনারই
রোমাঞ্চিত অসীম আঁধারে
আত্মা খোঁজে কারে···
সে কি তুমি !

৮ ভাদ্র ১৩৪৬

প্রাণায় স্বাহা

তান্ত্রিক :

রতিতৃষিত রমণী, ধ্যান করি তাকে
অনন্তবাসররাত্রে যে আমায় ডাকে
ভূমিতলে নগ্নতনুশয্যাখানি পাতি—
যে আমার সাথি।

নাই লজ্জা, নাই ঘৃণা, নাই যার ত্রাস ;
অনন্তবুভুক্ষাপাশে বেঁধে কৃতদাস
আমারে করিবে বন্দী চিরক্রীতদাসী
মায়াবিনী। স্নেহ সুখ ভালোবাসাবাসি
মিথ্যা কথা। পীড়নে মর্দনে খান্ খান্
বক্ষোত্তুটি। সুধা বিষ বহ্নির সমান
রুদ্ধশ্বাস চুম্বনেতে প্রাণ শুধু পান
পরস্পরে। মূর্ছিত চেতনা ; সেই ক্ষণে
বিশ্বচরাচর লুপ্ত। সাধ হয় মনে
নিঃস্ব হয়ে, নগ্ন হয়ে, মগ্ন হয়ে থাকি
কুহূনিশীথিনীসম মুক্তকেশ ঢাকি,
জঙ্ঘে, উরুযুগে, পীন নিতম্বে জঘনে,
কঠিন কোমল দৃপ্ত সুধাধার স্তনে,
অধরে, কপোলে, কক্ষে, চক্ষে চক্ষে তার
ধাবমান লক্ষ লক্ষ শোণিতসেনার
কণায় কণায় পশি'। শেষ সর্বনাশে
দেহাঙ্গুলিপুটে তার দেহবেদিবাসে
ইচ্ছা হয় এ জীবন দিই শুধু ঢালি
মন্থনাপ্রবুদ্ধ গূঢ় কালানল জ্বালি
ওঁ স্বধা ওঁ স্বাহা বলি।

রতিতৃষিত রমণী, ধেয়াই কেবলই,
অনন্ততমিস্র রাত্রে যে আমায় ডাকে,
কালকল্পবাহুপাশে যে নেয় আমাকে,
প্রলয়পয়োধিতলে গর্ভের গহনে
সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপা বীজ যেবা বোনে
অনন্ত রূপের হারে আমারে গ্রথিতে—
শত জন্ম শত মৃত্যু দিতে।

১৩৪৮

প্রবাসী

কেন আছ
কেন আজও বেঁচে আছ ভাই ?
জীবনের কোনো অর্থ নাই।
দুঃখসুখ সৌন্দর্যশিহর
যা আছে জীবনে
অতর্কিত আকস্মিক ক্ষণে—
নিয়ত সঞ্চীয়মান ঋণ।

বসন্তবাতাস প্রতিদিন
করে জলকেলি, ফুল ফোটে,
কণ্টকিয়া ওঠে গুল্ম,
শেষ রবিকর
তালের বাকল-'পর
মুছে ফেলে স্বর্ণবর্ণ লেখা,
নারিকেল তরু একা
স্বপ্নমরু-মাঝখানে জেগে থাকে রাতে,
পল্লবঝালরে স্থির পাতে
হিমশিখা জ্বালায় কৌমুদী।

চক্ষু মুদি
নির্নিমেষ মৌনময় প্রাণে
অন্তিম কী সুখের সন্ধানে
বুঝেছি, এখানে
এই বিশ্বে আমি অবান্তর।
অসীম অবর্ণ শূন্যে কিম্বা ধূলি-'পর
চুমি শ্যাম তৃণের শিখর
আলোকশিহর, কিম্বা তিমিরসোহাগ,
দুর্বার অনুরাগ

বেদনা আমার
তার
ক্ষীণাভাস।

এ প্রবাস
আমার প্রবাস
যত
অসীম সুন্দর হোক,
তবু, অবিরত
কেন বাঁচি
কেন আমি বেঁচে আছি ভাই—
জীবনের কোনো অর্থ নাই।

৮ ভাদ্র ১৩৪৬

হৃদয় আমার

উপবাসী ভিক্ষুক হৃদয়
বসে থাকো ঔদাস্যের ভানে
সংসারের এক ধারে স'রে।

অন্তরে অন্তরে
দুই কর জুড়ে
আতুর অঙ্গুলি তুলি, দূরে
কোন্ স্বর্গ হতে
কার অবতরণ-কামনা করো তুমি?
সুরধুনীধার?

হায় রে আমার
ভিক্ষুক হৃদয়,
মনে হয়
অনাদি কালের থেকে

এ ভাবে বসায়ে রেখে
কত শত জগতের পথের ধূলিতে
কে যে
দেখিছে কৌতুক
অন্তহীন কাল!
সহাস্যসুন্দর মুখ সেই নিষ্ঠুরের
এ আলোতে
যদি বা দেখিতে পেতে—
এ আঁধারে যদি একবার
তার
স্পর্শ পেতে হৃদয় আমার,
হৃদয় আমার!

৮ ভাদ্র ১৩৪৬

মেঘদূত

নগরআকাশে
অকস্মাৎ মেঘ করে আসে।
দিক্‌ডমরুর ধ্বনি
বাজিল যেমনি,
যন্ত্রযানে কর্কশ ঘোষণা
নাহি যায় শোনা।
পরশ-পিপুল
গাছে গাছে ফুটেছে যে ফুল
কে জানিত!
নিবিড়পুঞ্জিত
সবুজ আঁধারে আজ জ্বলে
নক্ষত্রের ছলে।
রক্তরাগবিচ্ছুরিত কৃষ্ণচূড়া গাছ
নিগূঢ়শীকরস্পর্শ পেয়েছে কি আজ—

তাই স্নিগ্ধদ্যুতি।
নারিকেল আনন্দআকৃতি
আন্দোলনে আন্দোলনে
বিথারে গগনে।
বোবা তাল
নিশ্চল বিশাল
ইশারা মেলিতে শুধু জানে।

নগরআকাশে
অকস্মাৎ মেঘ করে আসে
কেন গো ঈশানে!

যুগান্তরে
রামগিরিশীর্ষে মনে পড়ে
দিয়েছিল দেখা
যক্ষ একা
যেথায় যাপিতেছিল বিরহবৎসর—
অশ্রুঘন-করুণায়-কোমল-অন্তর
নদী গিরি কান্তার প্রান্তর
উত্তরিয়া
কৃষ্ণএকাদশী চাঁদ যেথা যক্ষপ্রিয়া
তৃষিত শ্রবণে তার প্রিয়বার্তা বহি
প্রিয়নাম কহি
দেখা দিয়েছিল।

যুগান্তরে আজ এ নগরে
আমিও বিরহী
জনতামরুর মাঝখানে—
প্রাণে
কী বিচ্ছেদ কেবা তাহা জানে!

দিন মাস বর্ষ নয়, প্রান্তর জলধি
গিরি বন নদ নদী
নহে বন্ধু,— যেতে পারো যদি
প্রাণেরই এ পার হতে ও পারে আমার
অনন্তে জমায়ে পাড়ি, দেখা পাবে তার
যে আমার প্রিয়।
বার্তা তারে দিয়ো :
দিন নয়, মাস নয়, বর্ষ নয়, প্রিয়,
আমি যে বিরহী জন্ম-জন্মান্তর
অন্তরে যে রয়েছ অন্তর
তোমারই মিলন-হারা হয়ে,
তোমারই বিচ্ছেদ-ভার সয়ে—
জ্বালো
চেতনার আলো
অন্তহীন এ বিরহ ছেদি
এ আঁধার দহি
হে বিরহী!

১৭ বৈশাখ ১৩৪৭

গান

ওগো বন্ধু, হৃদয়-বন্ধু,
তুমি হিয়ার হার।
তোমা বিনা তোমার কথা
বলব কারে আর?
তুমি দিনের আলো আমার,
রাতের অন্ধকার গো,
বন্ধু আমার!

ঘোচে যখন সকল পাওয়া
সকল খোঁজা

আপনাতে-আপ্‌নি-বোজা
ও বঁধু
রাতের পদ্মফুলের হৃদে
তুমি গোপন মধু,
বন্ধু আমার !
তোমা বিনা তোমার কথা
বলব কারে আর ?

কলিকাতা
৩১ বৈশাখ ১৩৪৭

গান

অনূদিত

মেঘ বরিষণ করে।
হৃদয়রমণ আজি যে আমার ঘরে।
গুরু গরজয়, বারি বরষয়,
সুখসরোবর ভরে।

বহুদিন পরে প্রিয়তমে পেয়ে
কাঁপি বিচ্ছেদডরে।
মীরা কহে, প্রেমে প্রাণ যে জুড়ালো।
ওগো জনমান্তরে
বন্ধু যে ছিল তারেই পেয়েছি
আজ যে আমার ঘরে।

৩১ বৈশাখ ১৩৪৭

চন্দ্রমা

সুন্দর মুখচন্দ্রমা ওগো,
আমার জীবন'অমা-
যামিনী-আঁধারে জ্যোৎস্নাহসিত কবে
তোমার উদয় হবে ?

তারই প্রতীক্ষা বেণুমর্মররবে
রহিয়া রহিয়া বাজে
আজি এ শ্রাবণসাঁঝে।
বুঝি ঝিল্লির সুরে
করুণ মিনতি পূরে
ধরাধূলিশায়ী কোন্ বীণাঅন্তরে—
মন যে কেমন করে
বিজনবনের মাঝে,
আমার মনের মাঝে।

সুন্দর মুখচন্দ্রমা ওগো,
আমার জীবন'অমা-
যামিনী-আঁধারে জ্যোৎস্নাহসিত কবে
তোমার উদয় হবে!

আষাঢ় ১৩৪৭

মেঘ ক'রে আছে

সারা দিন মেঘ করে আছে!
দূরে গেল কাছের জিনিস,
দূর এল কাছে!

প্রিয়বিরহিত ঘরে প্রেমের স্বপন
আচ্ছন্ন করেছে প্রাণমন—
আবিষ্ট করেছে দু নয়ন।
সে স্বপ্নে কি,
চেয়ে চেয়ে দেখি,
দীঘির সীমায় তাল-খেজুরের বন
ক্ষণে ক্ষণে তোলে শিহরণ!
কৃষ্ণচূড়া ভিজে রক্তরাগে
স্নানশুচি সুন্দরীরে পরালো সোহাগে
সীমন্তসিঁদুর।

দূরে-চাওয়া পথ'মাঝে
সর্বঅঙ্গে সুমধুর
সোনাল ফুলের সাজে
আজ এ
শ্যামা মেয়ে লাবণ্যেতে ছলোছলো করে ;
বুঝি মনোহরে
ডাকে তার মৌনের ভাষায়।

পথ চেয়ে আশায় আশায়
গেল দিন। মেঘ করে আছে।
দূরে গেল কাছের জিনিস!
দূর কই এল না তো কাছে!

বোলপুর
১৮ বৈশাখ ১৩৪৮

অনন্ত মুহূর্ত

মাঝে মাঝে মেঘ যায় ছিঁড়ে,
ক্ষান্ত হয় কলরবরাশি।......
স্পর্শের অতীত দূর তীরে
শূন্য শুধু শূন্য আছে ঘিরে......
নিঃসঙ্গ নির্বাক্ তারাটি রে
অন্ধকারে অবিচল-হাসি।
শূন্যতার কোনো বর্ণ নাই।
দিন? রাত্রি? জানি না যে, ভাই,
যারে বলি অন্ধকার তাই
হয়তো বা আলো অবিনাশী—
নিঃশব্দই অন্তহীন গান।......
মাঝে মাঝে মেঘ যায় ছিঁড়ে,
অবারিত দেখি সে বিমান
ঊর্ধ্বে অধে যা রয়েছে ঘিরে।

১৯ বৈশাখ ১৩৪৮

মৃগতৃষ্ণা

চেয়ো না চেয়ো না বারে বারে
পথে যেতে পথের দু ধারে।
শ্যামা যদি শিস দেয়,
পিকবঁধু ডাকে,
ফুলঅঞ্জলি বন
তুলে ধরে রাখে
আকাশের পানে,
তৃষা বাড়াযো না মাযা-
মরু-মাঝখানে।

অবোধ হরিণ-হেন
নাভির সুবাসে
চমকি ফিরো না ভুলে
আজ বনবাসে
নব ফাল্গুনে,
ঘর ছেড়ো না গো শ্যাম'-
বেণুরব শুনে।

স্বপনমুকুর জেনো
মধুপূর্ণিমা.
যে মুখ ফুটেছে প্রেম'-
বাসনার সীমা
ছবি হয়ে শোভে,
চুমা বাড়ায়ো না তারই
অধরের লোভে।

থমকি থেমো না ওগো
বিহগের গানে—

প্রাণ বাড়ায়ো না নীল-
সবুজের পানে
ফুলের বাহারে,
ঝাঁপ দিয়ো না গো কূল-
হীন পারাবারে।
চেয়ো না চেয়ো না বারে বারে
পথে যেতে পথের দু ধারে।

বোলপুর
২২ বৈশাখ ১৩৪৮

দেখা-দেখা খেলা

শূন্যতলে বসে রই, বলি 'আলো হোক'—
অন্ধকারে দেখা দেয় দ্যুলোক ভূলোক!
রঙে রঙে রজতে হিরণে
তারাগুলি কিরণে কিরণে
ঝলকায় স্বচ্ছনীলে শফরীর ঝাঁক!
পর্বতের শ্যাম শুভ্র চূড়া
চুমে যায় ত্রিসন্ধ্যাবধূরা,
সিন্ধুহ্রদে নিত্য দোল, অরণ্য অবাক্
বাড়ায়ে সহস্র বাহু কারে দেয় ডাক!

শূন্যতলে জেগে উঠি খুশি লয়ে প্রাণে—
মৃত্যু তাই অমৃতের ধারা বয়ে আনে।
দুঃখে সুখে সংসারের ঘাটে
বাঁশি বাজে নিত্য নব নাটে—
পাখি আর প্রাণ আর প্রেম গান করে!
চোখে জল মুখে ফোটে হাসি,
রাতে দিনে হৃদয় উদাসী
রূপ হতে ধেয়ে যেতে চায় রূপান্তরে!
দেহপ্রদীপের আলো দেহেতে না ধরে!

অন্তরে দু চোখ মেলে দেখা-দেখা খেলা,
এ শুধু যা-খুশি তাই হওয়া তুই বেলা—
পুলকিত চেতনার অহেতু বিলাস !
শূন্যময় স্বজনের রাস !

বোলপুর
২৬ বৈশাখ ১৩৪৮

নিশিশেষে

নিশিশেষে
নিশার স্বপন ভোলো।
মেঘকজ্জলে দিগন্তবন'-
লেখা ঐ কালো হল।
ক্ষণতূলিকায় আঁকা
চমকি মিলালো চকিত বকের পাখা।
দীঘিজলে টলোমলো
ডুবিল কমল ধারাবর্ষণঘাতে
আজি এ বাদল-প্রাতে।
মিছে কেন আর
আশাআশঙ্কাদোলায় তবে গো দোলো!
নিশার স্বপন ভোলো।

ধুয়ে মুছে যাক ব্যাকুলবৃষ্টিজলে
নিভৃতজীবনতলে—
চৈত্ররাতের কুঙ্কুমরাগ,
কৌমুদীমায়া, সুরের সোহাগ,
মর্মের মূলে চুম্বনদাগ,
ভ্রষ্ট পাপড়ি তারই গো যে মালা
পরিলে পরালে গলে।
ধুয়ে মুছে যাক আজি এ বৃষ্টিজলে।

শরৎপ্রভাতে বাউল আলোকে
সাথি ক'রে, মোহলেশহীন চোখে,
দিশাহীন দূর -সন্ধানে তোর
যাবার সময় হল।
নিশার স্বপন ভোলো।

বোলপুর
৩১ শ্রাবণ ১৩৪৮

শরৎশ্রী

শরতের আলো আর শরতের ধান
আকাশ-ভুবন-ভরা
ভুলালো রে প্রাণ।

হেলে দোলে সোনাঝুরিগুলি
কোথা বনবীথিতল পুলকে ব্যাকুলি !
শেফালি লাজুক মুখ তুলি
বলে, নিশি হল অবসান।—
উঠোন বিছায়ে ঝরে :
লাজসিন্দূরে আঁকা
লাজ'অঞ্জলি -ঢাকা
ছোটো উঠোনের মাঝখান।

শরতের আলো আর শরতের ধান
সমুখে আমার ঐ
মাঠ ভ'রে থৈ থৈ,
সোনায় সবুজে যেন ব'য়ে গেছে বান
ভরে গেছে প্রাণ।

বোলপুর
শ্রাবণ ১৩৪৮

দূরাশা

ভেবেছিনু গানের ফসল
শরতের ধানের সমান
শ্রাবণবর্ষণশেষে
আলোকে ছায়ায় হেসে
হৃদয়ের অতিদূর দিগন্ত-অবধি
শিহরি শিহরি নিরবধি
দুলাবে ভুলাবে সারা দীর্ঘ দিনমান—
বেড়ার ও ধারে ঐ ধানের সমান
সহজ সবুজ মোর গান।

ফিরে ফিরে ঘিরে আসে শ্রাবণের দিন।
অন্তরে শিউলি-ঝরা এল না আশ্বিন।
আর আসিবে কি ?
অন্ধকারে সারা রাত্রি দেখি
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা ঝরে : গান যায় ডুবে
সুগভীর বেদনায়। পূবে
আলোর আভাস কোন্‌খানে ?
ঝোড়ো হাওয়া ছিন্ন কথা আনে,
ছড়ায়ে ফেলে তা দূরে
ছিন্নভিন্ন সুরে।

বোলপুর
১৭ ভাদ্র ১৩৪৮

সুরের রানী

সুরের রানী, আবার তোমার সুরের তরীখানি
লাগবে কি এই প্রাণের ঘাটে ?
এ প্রাণ সুরধুনীর ধারা
ধায় যেথা ঐ পাগল-পারা

সুদূর নিরুদ্দেশে হারা
উল্লসিত ঢেউয়ের নাটে
ভোরের বেলা তরীখানি
লাগবে তব, বিজন ঘাটে।

সকাল-সাঁঝে বিজন ঘাটের ভাঙা-পাঁজর-মাঝে
বাজে জলের করতালি।
শ্যাওলা-সবুজ সোপান-বুকে
শিউলি ঝরে শরম-সুখে,
মালতীফুল অধোমুখে—
অনাদরের পূজার ডালি
কেবল ভেসে যায় কোথা সে ?
বাজে জলের করতালি।

নিশীথ-রাতি চমক-ফোটা লক্ষ জোনাক-পাঁতি
জ্বালায় চূত-অশথ-শিরে।
ঝিল্লিরবের সুরে সুরে
স্বপ্নে শুনি কোন্ নূপুরে
আগমনী গান যে দূরে
বাজে দুটি চরণ ঘিরে—
ভীরু আশা তাই চমকে
লক্ষশত, অশথ-শিরে।

রজনী দিন শূন্যে যে ধায় চরণ-চিহ্ন-হীন,
নিদাঘ শরৎ শিশির আসে।
কভু ঝরা বকুল ফুলে
সাহানাসুর বিছায় ধূলে,
অশ্রু ভরি হাসির কূলে
জাগে শরৎপূর্ণিমা সে।

বিফলে হায় বারে বারেই
বর্ষা শরৎ শিশির আসে।

সুরের রানী, ভিড়বে তোমার সুরের তরীখানি
আবার কবে প্রাণের ঘাটে?
স্বপনে যার নয়ন ফুটি
যেন গো শুক্‌তারা দুটি
ভোর-বেলা তায় জেগে উঠি
দেখব আমার প্রাণের পাটে,
তোমার সুরের তরী যখন
ভিড়বে এ মোর বিজন ঘাটে।

বোলপুর
২১ ভাদ্র ১৩৪৮

অন্বেষণ

অনিমেষে চেয়ে চেয়ে তবু সারা দিন
তোমায় পাই নে খুঁজে।
ক্ষেতের সবুজে আর আকাশের নীলিমায় লীন,
ভাসমান মেঘ হতে
রৌদ্রছায়াতরঙ্গিত স্রোতে,
দিকে দিকে পথে পথে
নিখিল ভুবনে ব্যাপ্ত হয়ে, আজি এ শরতে
তব সত্তাখানি
দরশের পরশের ধেয়ানের ধারণার পার।
নিজেকেও হারাই আমার.
অসীম শোভায় : কথা থাকে না কিছুই।

দ্বারপ্রান্তে ফুটে ওঠে জুঁই
সিতসন্ধ্যাবেলা।

জুঁইফুলী জোনাকির মেলা রসালে মহুলে।
স্বপ্নে সে কি, সে কি মনোভুলে,
রুদ্ধদ্বার খুলে নির্জন ঘরের
মনে হয় তুমি আছ ঘরে,
স্বহস্তে প্রদীপ জ্বেলে
মনে হয় তুমি সরে গেলে ঈষৎ অন্তরে।

তুমি যেন আছ মোর পার্শ্বে বা পিছনে;
জুঁই বেলি বকুলের সৌরভসিচনে
ঢাকে না তো তোমার সুবাস;
চতুর্থী চাঁদের আলো
ঘরের বধূর হাসি ভুবনে ছড়ালো—
ঝিল্লি যেন প্রতিধ্বনি করে
ভূষণশিঞ্জিনী লয়ে প্রহরে প্রহরে।
ঘরে আছ, দ্বারে আছ, বড়ো কাছাকাছি
আছ তুমি স্বপ্ন দিয়ে দুটি চোখ ঢাকি
সুপ্তি দিয়ে বুকে তুলে রাখি
অর্ধরাতে।— তুমি আছ, তাই আমি আছি।

ভ্রান্তি এ কি?
সারা দিন দেখি তোমায় পাই নে খুঁজে।
নভোনীলে ক্ষেতের সবুজে
সীমাহীন শোভায় নিলীন
তোমারে হারাই প্রিয়ে,
হারাই আমারে।

বোলপুর
রাত্রি। ৮ আশ্বিন ১৩৪৮

দেখা

খাতার পাতায় কী লিখিব লেখা!
দেখা, শুধু চোখ চেয়ে দেখা।

তৃণে তৃণে ঝলিছে শিশির প্রভাত-বেলায়।
ছোটো উঠোনটি ছেয়ে ঝরিল হেলায়
এক-পাটি টগর ও শেফালির ফুল।
এই বেড়া ওই নীল আকাশের কূল
উছলি উছলি চলে সবুজের বান—
শরতের ধান।
উড়ে উড়ে টুন্‌টুনি পাখি
ফুলে ফুলে খুঁজে দেখে মধু আছে নাকি।
বিকালের আলো
স্বর্ণবর্ণ আবীর ছড়ালো
বন্ধুর কপোলে কেশে
চৌকিতে চৌকাঠে আর সোপানের শেষে।
খোয়াইডাঙার বুক জুড়ে
সিতজ্যোৎস্না ধু ধু করে দূর হতে দূরে—
শিহরিত বোবা তাল গাছে
ধ্যানের চেতনা জেগে আছে
সারা রাত্রি সে স্বপ্নের পিছে,
সে শূন্যের নীচে।

মিছে, হায়, মিছে
খাতার পাতায় বোবা কথাগুলি লেখা।
দেখা, শুধু প্রাণ দিয়ে দেখা।

বোলপুর
রাত্রি। ১৫ আশ্বিন ১৩৪৮

জ্যোৎস্না

জ্যোৎস্না যেন গলে পড়ে
রসালে মহুলে শ্যামলে পাতায় পাতায়।
মাঠে ঘাটে শুয়ে থাকে আঁচল বিছায়ে।
স্বপ্ন দেখে খোড়ো ঘরে দাওয়ায় উঠোনে
মোর এ নির্জনে।
খোলা জানালায় পশি শূন্য বিছানায়
জাগে, না ঘুমায়?

চেয়ে চেয়ে দেখি—
আমার কী লাভ ক্ষতি
শরৎরাত্রির এই স্বপ্নসুষমায়!

নিখিলের কিবা লাভ ক্ষতি
আমার দুঃখে ও সুখে, জয়ে পরাজয়ে,
ধুক্-ধুক্-ধ্বনিত এ বুকে
আশায় ও ভয়ে?
আমি কোথা আছি?

আমি থাকি না'ই থাকি
নীলাকাশ-পানে মেলে নবনীল আঁখি
জাগে ঘাস-ফুল।
দু সন্ধ্যার কূল
প্লাবিয়া বহিয়া যায় আলোকের ধারা।
সারা রাত্রি তারা
ধ্রুবেরে বেষ্টন করি
অনন্তে দিতেছে পরিক্রমা।
অহেতুক ফুটে থাকে এ স্বপ্নসুষমা
নিযুপ্ত ভুবনে--

মাঠে ঘাটে গ্রামে ও শহরে—
রসালে মহুলে শালে পাতায় পাতায়
কাননের মাথায় মাথায়
অহেতুক গ'লে পড়ে।

রাত্রি। ১৫ আশ্বিন ১৩৪৮

শূন্য-পূর্ণ

ওগো শূন্য, ওগো পূর্ণ,
তুমি কি লবে না তুলে আমার এ গান—
আমার এ প্রাণ
আমার জীবন?
এই ভাব ভাষা—
এই স্বপ্ন আশা—
এ বুকের এই ধুক্-ধুক্?
ব্যর্থ সুখ, ব্যর্থ দুখ,
ব্যর্থ সব অস্তিত্ব আমার
তোমাহারা হয়ে।

ওগো শূন্য, ওগো পূর্ণ,
তোমায় জানাব
হেন ভাষা আমি কোথা পাব—
তুমি যদি না বোঝো সে,
আমায় না খোঁজো এসে,
না করো পরশ
মুহূর্তের তরে?
ওগো শূন্য,
ওগো পূর্ণ!

বোলপুর
রাত্রি। ১৫ আশ্বিন

রূপনারাণের কূলে

'রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম
অর্দ্ধরাতে।'

অকস্মাৎ রাত্রি হল ভোর?
হায় কবি, মোর
আজন্ম পরানপণে জাগা হয় নাই।
স্বপ্নে যেন পাখা মেলে যাই
আকাশেরে ছুঁতে—
ছোঁওয়া তারে যায় না কিছুতে।
ধরণীর ধূলি,
ফুলগুলি,
তাও কি অঞ্জলি ভরে কভু?
শতবার চুমিয়াও তবু
প্রিয়ারে কি চিনিয়াছি
শিশুরে দেখেছি?
যতকাল বাঁচি
জাগিবার আশা নাই।
মৃত্যুপথ চাই।
সেও মোহ, সেও যে স্বপন।

রাত্রি। ১৫ আশ্বিন

মহাপ্রাণ

মহাপ্রাণ বন্দী হয়ে আছে
দেহ আর মনের খাঁচায়।

উন্মুক্তনয়নবাতায়নে
আকাশের পানে ধেয়ে যায়,
যে আকাশ ধরণীর

চুমে দিক্-সীমায়-সীমায়……

ফিরে আসে।

নিঃসীম আঁধারে তারালোক

নিঃসীমতরের ছলনায়

সারা রাত্রি কারে

নিরর্থক ডাকে অভিসারে।

সুপ্তির অন্তরে

সঞ্চরে যেজন তার সঙ্গ নাহি ছাড়ে—

দেহের কামনাচয়, মনের কল্পনা।……

মুক্তি তবে রয়েছে কোথায় ?

মহাপ্রাণ বন্দী হয়ে আছে

দেহ আর মনের খাঁচায়,

জন্মে ও মরণে,

বিচ্ছিন্ন স্মৃতির ডোরে,

চিরবিস্মরণে।

রাত্রি। ১৫ আশ্বিন

লি-পো

রমণীর ভালোবাসা ? হৃদয়েব খেয়া-

ঘাটে ঘাটে ঢেউ খাওয়া ? হার জিৎ ? প্রাণ-দে'য়া-নে'য়া ?

সে-সব এসেছি ফেলে পাছে।

সুরা, তিক্ত সুমধুর সুরা,

তা ছাড়া জীবনে কিবা আছে ?

সে নেশার ঘোরে চেয়ে দেখি

ঘাসের ডগায় দোলে একি

আলো-ঝলা মণি !

পূরবে এখনি

লি-পো

ভোর হল বুঝি !

চোখ বুজি।

চোখ খুলে ফের

চিহ্ন দেখি নেই শিশিরের

ঘাসের ডগায়—

একটু ডালিম-ফুলী

রঙের বাহার ! বুঝি

এসেছে গোধূলি।

নেশাখোর এ অখ্যাতি লি-পো

করে অবহেলা।

অলস বোলো না। কাজ

করিবার বেলা

কই ?

দিন এল, দিন গেল ওই !

১৮ আশ্বিন ১৩৪৮

কবিতাটি চৈনিক ছাঁদে হয়তো হওয়া উচিত—

ঘাসের ডগায় শিশির ঝল্‌মল্‌।

সকাল।

চোখের পলক।

ঘাসের ডগায় রঙ ডালিম-ফুলী।

গোধূলি।

নেশাখোর ?— হ্যাঁ।

অলস ?— কৈ

কাজের ফুরসৎ !

অথবা ছন্দে—

ঘাসের ডগায় শিশির-ঝলক।

সকাল বুঝি ? চোখের পলক।

ঘাসের ডগায় ডালিম-ফুলী

রঙ ছোঁয়ালে। কে ? গোধূলি ?

মাতাল বটি। অলস তো নই—

কাজ করি তার সময় বা কৈ ?

মৌমাছি

কী বিচিত্র মরকতথালা !
স্থবর্ণমদিরাধারা-ঢালা
নীলকান্তমণির পেয়ালা !
তারই প্রান্তে আছি
মোহগ্রস্ত অলস মৌমাছি ।

গুন্ গুন্ ডানার গুঞ্জন—
বেলা যায়, যায় এ জীবন ।
উবে যবে যায় রসধারা
এ কেমন ধারা
কুচি কুচি হীরকের কাজ,
চেয়ে দেখি, পেয়ালার মাঝ !
ঘুমাতে চাই কি ! তবু আজ
ঘুমভারে দুটি চোখ আলা !

ধরাবক্ষে স্থদূর অধরা
রয়েছে উপুড়-করা
অয়স্কান্তমণির পেয়ালা ।

বোলপুর
১৮ আশ্বিন ১৩৪৮

নাই

নাই নাই নাই—
আকাশঅঙ্গনে নাই
চরণের চিহ্ন পথিকের ।

সূর্য চন্দ্র তারা
অন্ধ অনুসন্ধানে তাহারা

চক্রপথে মরে ঘুরে ঘুরে
কল্প কল্প দূরে দূরে
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের শিরে
দিনের দীপ্তির স্রোতে রাত্রের তিমিরে
বিভ্রান্ত সদাই।

আকাশঅঙ্গনে নাই
চরণের চিহ্ন পথিকের—
নাই নাই নাই।

৭ কার্তিক ১৩৪৮

হৈমন্তিকা

রৌদ্রঢালা দূর বনচ্ছবি আকাশের নীচে।
জীবনে যা সত্য বা কল্পনা
জীবনে যা মিছে
সব ভুলে যাই,
যত চাই, ওর পানে চাই
মেলে মুগ্ধ মৌন দুটি চোখ।
আকাশ আলোক আর
দিগন্তের পারে দিগন্তরে
বিস্তৃত ভুবন,
মন বলে, আছে আছে আছে।

পথ-চলা এ জীবন
যে রহস্য ভেদি জেগেছিল
সে রহস্যে মিলাক মিশাক,
চিহ্ন থাক্ না'ই থাক্ পিছে—
আকাশ আলোক আর অসীম ভুবন,
মন বলে, আছে আছে আছে।

ঘনশ্যাম দূরবনচ্ছবি আকাশের নীচে,
হেমন্তে হেমায়মান ধান-ক্ষেত রৌদ্র পোহায়িছে—
জীবের জীবন শস্য মরণে বিলায়ে দিয়ে যাবে
এ প্রার্থনা প্রাণে আছে তারই,
নীল ফুল তৃণে তৃণে দিতেছে সঞ্চারি
নক্ষত্রের দ্যুতি
দূরঅনুভূতি।
চেয়ে দেখি, তাই চেয়ে দেখি :
দুঃখে নয়, সুখে নয়, প্রাণ পূরে একি
অপূর্ব বিষাদে !

৭ কার্তিক ১৩৪৮

দূর ও নিকট

কী কথা বলিতে চাই প্রাণের বন্ধুরে
যে আছে একান্ত কাছে পরানের পুরে
যে আছে একান্ত দূরে দূ সন্ধ্যার মেঘে
আলো হয়ে আভা হয়ে লেগে—
যারে শুধু অনুভবে পাই,
দেখি নাই, যার কথা কানে শুনি নাই।

যে কথা বলিতে চাই শেষ নিবেদনে
সুখ সে কি ? দুঃখ সে কি ? সে কি গো জীবনে
দুঃখসুখঅতীত বেদনা ?
শুক্লপক্ষচন্দ্রিকার চারু আলিপনা
বক্ষে তারই আঁকা,
আশ্বিনে উৎফুল্ল ধানে শ্যামসুধা-মাখা
মৌনবাণী সে যে,
বকুলসৌরভে ভরি তারার বাঁশিতে ওঠে বেজে,
আজি এই হেমন্ত দুপরে
আপক্ক ধানের ক্ষেতে মর্মরে শিহরে

রৌদ্রে অবগাহি,
পাণ্ডুর দিগন্ত -পানে চাহি,
নতশীর্ষ ধানেরই মতন
আত্মসমর্পণ-অভিলাষী।

কী সে ভাষা! কী সে আশা!
যদি ভালোবাসি
কারে ভালোবাসি আমি?
দর্শস্পর্শতৃষাতুর দিবসযামিনী
চায়
প্রাণের বন্ধুরে
যে আছে একান্ত কাছে পরানের পুরে,
যে আছে একান্ত দূরে আকাশে আকাশে
সুরে ও আভাসে।

বোলপুর
২৫ কার্তিক ১৩৪৮

মাস-ফল

সখী, বড়ো নিদারুণ শুনি মাস-ফল—
এ ফাগুনে নাই মোর গানের ফসল।
তুই যদি আঁখি তুলে চাস,
নয়নে অধরে হয় হাসির বিকাশ,
তোর আঁখিতারা-ভাতি জাগিবে কেবল—
কী করিবে গগনের গ্রহতারা-দল
বল্ মোরে বল্।

আষাঢ়ে মনে কি পড়ে চ'ড়ে রেলগাড়ি,
নিদয়ে, মুঙেরে যবে দিয়েছিলে পাড়ি,
নবযুগে নব মেঘদূতী

রচনার আশা ভাষা গর্ব আকৃতি
হল দূর। তুমি যদি চলে গেলে ছাড়ি,
কোথা পাব মেঘভার বিদ্যুৎবারি
বলাকার সারি?

নিরজন ত্রিজগৎ রুদ্ধ কপাটে—
আমি রব জানালায়, তুমি রবে খাটে।
এলায়িত কেশঘন কালো,
কটাক্ষে খনে খনে চপলার আলো—
এলায়িত ঘন কালো কেশে
স্থির যূথীমালা নয়, ঐ যায় ভেসে
বলাকার সার, ওরা দূর ঘাটে ঘাটে
খুঁজিবে প্রিয়ারে চির গূঢ় প্রাণপাটে
দিন যার কাটে।

দাস হবে কালিদাস নতুন যুগের
এ আশায় হানি বাজ না গেলে মুণ্ডের
কী জানি কী ছিল মহাক্ষতি।
যা-হোক ফিরেছ, ফিরে এল সম্প্রতি
ধরাতলে মধুমাস। দুর্ভাগ্যের
অবধি হোক-না, সখী, মূক এ প্রাণের
নির্ভাষণের।

জীর্ণ জরার বুকে এল ফাল্গুন,
পলাশে শিমূলে জ্বলে রঙের আগুন,
নবরবিকিরণমদিরা
ভরে দেছে এ দেহের শিরাউপশিরা—
কোকিল পাপিয়া শ্যামা ডেকে ডেকে খুন
মাস-ফলে আমি বোবা? একি নিদারুণ
ভাগ্য বিগুণ।

শোন্ সখী, শোন্ মোর এক নিবেদন—
গ্রহতারাদের ষড়্যন্ত্র-ভেদন
হেসে চাক আঁখিতারা-দুটি,
ফুল্লঅধর-ফুল গৌরবে ফুটি
ঢেলে দিক প্রণয়ের গন্ধ-বেদন—
প্রাণেতে লাগুক নব গীতযৌবন
নবজাগরণ।

বোলপুর
৮ ফাল্গুন ১৩৪৮

বসন্তবউরি

বসন্তবাউল ঐ পাখি
গহন সবুজে শ্যাম তনু দেহ ঢাকি
মুকুলিত চূতশাখে কোথায় একাকী
কুব্-কুব্-কুব্ সুর সাধে,
একতারা যন্ত্র যেন বাজায় রে খাদে
দীর্ঘ দিনমান।···
দিগন্ত পারায়ে দূরে
দিগন্তরে পথ গেছে ঘুরে।

বোলপুর
২৩ ফাল্গুন ১৩৪৮

'আছি'

মৃদু মধু তিক্ত গন্ধ প্রফুল্ল নিমের
বলে 'আমি আছি'।
ফোটে ফুল, পলাশ, শিমূল।
শিশ দেয় বুল্‌বুল্,
ছায়াঘন রসাল-বকুল-
কাননে পাপিয়া পিক করে ডাকাডাকি।

একই কথা সব ফুল বলে সব পাখি—
সন্ধ্যার আঁধারে নিম মলয়ে উচ্ছ্বাসি
বলে 'আমি আছি'।

২৪ ফাল্গুন ১৩৪৮

চিরন্তনী

খবরের কাগজেতে জানি
সত্য-শিব-সুন্দরের মধুমূর্তি বাণী
তুচ্ছ করি যূথবদ্ধ দুর্মদ মানব
করে হানাহানি
পূর্ব ও পশ্চিম সিন্ধু -তটে।......

তবু মোর দ্বারের নিকটে
রোমাঞ্চিত এ বনপুলক;
দ্যুলোক ভূলোক হেসে চায় পরস্পরে
উৎসবসজ্জিত বনভূমে
কাঞ্চন অরুণ শ্যাম সবুজের ফাঁকে।
কত দিকে কত পাখি ডাকে।......

বিষবাষ্পে অগ্নিস্রোতে
নিজ কর্মদোষে
যদিবা মানবজাতি ধরাপৃষ্ঠ হতে
মুছে যায়,
তারও পরে
শুকতারা সন্ধ্যাতারা প্রশান্ত অম্বরে
দেখা দিবে নাকি?
ডাকিবে না পাখি?
প্রতি প্রাতে প্রণয়ের রাখী

সমুদ্রবসনা এই সুন্দরীর করে
বাঁধিবে না নবসূর্যকরে ?

বোলপুর
২৪ ফাল্গুন ১৩৪৮

মেজেনের ব্যথা

মনে কেন সুখ নেই !……
আগড় খুলতে দেখি আজকে ভোরেই
বাচ্ছা বিইয়ে সুখী আমার 'কাজলী'।
মাঝির ভাগের ধান সাঁইত্রিশ সলি
ঘরে তো উঠেছে আজ।
দেয়ালে নতুন ভাজ
খেজুর-ছড়ির আল্‌পনা
এঁকেছে যা এ পাড়ায় আর-কোনোজনা
তেমনটি পারে !

তবু, মনে সুখ নেই। দুম্‌কা পাহাড়ে
মা বাপ তো ভালো আছে পেয়েছি খবর।…
মনে কেন সুখ নেই ! দুপরের পর
অসাবধানেতে লাল কলসীর কানা
খ'সে গেল।……
না, না,
মিছে মন ভারী ক'রে আছি !
জল আনা
বাকি আছে কোপাইএর ঘাটে।
সুয্যি বসেছে ঐ পাটে।

আহা, এই ঘাটপথে যেতে
এই তো কাদের রেড়ী-ক্ষেতে

লাল-কচিপাতা-ভরা গাছটার ডালে
মুচড়ে ভেঙেছে কেউ !··· দেখেছি সকালে ! ··
দেখ্ ভাই, রোদ্দুরে
ঝল্‌সে গিয়েছে যেন পুড়ে !

১২ ফাল্গুন ১৩৪৮

বিবাহের বহু বৎসর পরে বাপের বাড়ি এসেছে

সাঁওতাল মেয়ে

ডাঙায় যে লোক নেই !
বাপের ঘর তো এই
গাঁ'র সব-শেষে !
মা বাপ ভাইরা মোর
মরেছে না গিয়েছে বিদেশে !···
চালার চিহ্ন নেই।
পোড়ো ভিত।···
আহা, সেই
একপাটি টগরের চারা
এত বড়ো হয়ে আজ দিয়েছে গা-ঝাড়া
নিজ হাতে পুঁতেছিনু যারে !
সাদা সাদা ফোটা ফুলভারে
উঠোন করেছে হায় আলো !···

কালো কালো
মেঘ ডাকে গুর্‌গুর্
পূব দিক ঢেকে !···
মরেছে না গেছে দূর
বিদেশে মা বাপ ভাই
এ দেশের থেকে !

১৯ ফাল্গুন ১৩৪৮

যোগীন

সম্মুখে উদাস দৃষ্টি মেলে
বসে থাকে চায়ের দোকানী—
জীর্ণ দেহ, জীর্ণ তার চালাঘরখানি।

ক্ষণে ক্ষণে শৃঙ্গনাদ করে
বাসে ও মোটরে—
রক্তিম ধূলির ঝড়ে ঢাকে দিগ্‌বিদিক।
মাথার উপরে সুরসিক
কুহু কুহু ডেকে ওঠে পিক
বসন্তে মুকুলফুল্ল মহুলের ডালে
সকালে বিকালে।
পিছনে জামের বন মরকত'সাজে
দিগন্তবিলাসী ধূ ধূ প্রান্তরের মাঝে
ঝলোমলো ঝল্‌মল্‌।
কালেজী ছেলের দল চটুল চঞ্চল,
মৃদুভাষী কেহবা ভাবুক,
তরুতলে চায়েতে চুমুক
দেয় জীর্ণ মোড়ায় আসীন
প্রতিদিন—
নগদ বা বাকি ফেলে রাখে।

শূন্য অবসরে
উদাস দোকানী বসে থাকে
জীর্ণ চালাঘরে
দৃষ্টি কোন্ দূর শূন্যে মেলি—
টুক্‌রো রঙিন আলো
দুয়োরে, পায়ের কাছে ফেলি
অবশেষে বেলা যায়।

গাঁজাগুলি কী যে খায়
জানি নে তা।
জ্ঞাতিবন্ধু জোত-জমি আছে তার দেশে—
অহেতুক এ প্রবাস।
শুনেছি বয়স্ক ছেলে বারম্বার এসে
উহারে ফিরাতে চায়।—
'দোকান করা কী দায়!
'পাঁচ-সাত টাকা কয় আনা
'বিলেত পড়েছে নানা
'গ্রাহকের কাছে,
'আদায় হলেই আর
'দেশে যেতে আপত্তি কী আছে!'

দিনে দিনে মিছে লেনা-দেনা
বেড়ে ওঠে; চুকেও চোকে না।
অবসরে চায়ের দোকানী
ব'সে থাকে তাই উদাসীন—
জীর্ণ তার চালাঘরখানি
জীর্ণতর হয় প্রতিদিন।

২৪ ফাল্গুন ১৩৪৮

মাস্টারি

এ ঘর, ও ঘর—
ছুটির দিনের অবসর
ভরে ওঠে কাজে ও অকাজে।

কাদার তালের মাঝে
কে আছে কী আছে তাই দেখি টিপেটুপে—
বাহিরিয়া আসে চুপে চুপে

অরূপ নেপথ্য ত্যজি অদ্ভুতের দল।
ভিড় ক'রে বালকেরা করে কোলাহল-
স্রষ্টার শরিক হতে কেহ করে দাবি
হাতের কাদার তাল প্রাণবান্ ভাবি
মূঢ়মতি আমারই মতন।
প্রতিবেশী কলেজের ছাত্রের যতন
স্কুলের ছাত্রেরে শিক্ষা দিতে—
টিউটরী বিদ্রূপ বা তর্জন গর্জন
শোনে ত্রস্তচিতে
শিষ্ট কিন্তু জড়বুদ্ধি ছেলে ;
সয় অবহেলে
কান-মলা, পৃষ্ঠদেশে চাপড ও কিল।

বাহিরে আকাশ নীল ;
শালের নতুন পাতা করে ঝিল্‌মিল্
সোনা-গলা রোদে।

বোলপুর-বিদ্যালয়
২৪ ফাল্গুন ১৩৪৮

শুক্লএকাদশী

শুক্লএকাদশী রাত,
দক্ষিণবায়ুর ঝড় বয়েছে কাননে।
অদৃশ্য তরঙ্গাঘাত
গাঢ়শ্যাম উপকূলে শুনি ক্ষণে ক্ষণে
ঝর্-ঝর্ সর্-সর্
রব ওঠে নিরন্তর—
চকিত তন্দ্রায় জেগে নিশীথশয়নে
দেখি, একি ঘরের বাহিরে,
এলানো-কুন্তলভার

কাননের ধৈর্য আর নাহি রে, নাহি রে—
বাতাসে প্লাবন বহে,
জ্যোৎস্নায় প্লাবন বহে,
সে প্লাবনে পুণ্যস্নান করে ফিরে ফিরে!
একি দেখি ঘরের বাহিরে!

সুপ্তদিক, সুপ্তদেশ—
আকাশের সব-শেষ-
সীমানায় তারাগুলি জাগে।
জীবধাত্রী জননীর
সেই ঊর্ধ্বে জাগে শির—
কোন্ দূর আহ্বান মর্মে এসে লাগে!
সুপ্ত যে সংসার কোলে
এ নিশীথে তারে ভোলে—
বুঝি চিরবল্লভের স্থির অনুরাগে
অনন্তযৌবনা দেবী একা বসি জাগে।

ফাল্গুন ১৩৪৮

শুক্লনিশা

শুক্লপক্ষ নিশাখানি প্রথম ফাল্গুনে।
শুষ্কআমলকীবীথি যেন জাল বুনে
রিক্ত শাখাপ্রশাখায়, ঊর্ধ্বে মেলিয়াছে
অচঞ্চল জলে। মোহমুগ্ধ দূরে কাছে
ঝাঁকে ঝাঁকে তারার সফরী, ঝলকায়
কনক-অরুণ। শব্দহীন ডুবে যায়
অনন্তে কোথায় শূন্য চাঁদের তরণী।

ঊর্ধ্বে অধে দিকে দিকে স্বপ্ন, এ ধরণী
পদতলে মনে হয় নয় রে কঠিন।

মানুষেরা স্বপ্নসিন্ধুতলচর মীন
সুপ্ত জনে জনে।

আমি কেন অকস্মাৎ
আধো জেগে খুঁজিতেছি আমার প্রভাত,
মোর দিন, অপূর্ব নূতন রাগে জ্বলে
এ স্বপ্নের কোন্ পারে, কোন্ ঊর্ধ্বতলে!

১৬ ফাল্গুন ১৩৪৮

রূপান্তর

নিশীথের এই শান্তি, এই সুপ্তি, সুধাধৌত মায়া,
ঋজুতনু সুগন্ধপর্ণীর মৃদু চঞ্চলিত ছায়া
নির্জন অঙ্গনে,
নিঃশব্দে সঞ্চিত হোক এবার জীবনে।
জন্মান্তরে এই সুখ
ভীরুপ্রাণ খদ্যোতিকা ঝলিয়া উঠুক
(নাম পরিচয় তার রবে না তখন)
আলো করি এতটুকু অন্ধকার কোণ
একটুকু আলোকের কণা।
এ কি স্বপ্ন? নিরর্থ কল্পনা?

শান্তিনিকেতন
১১ ভাদ্র ১৩৪৯ রাত্রি

স্বপ্নাভিসারিণী

শরমে জড়িত মৃদু সোহাগের বাণী
কানে কানে কী আমারে বলেছিলে, রানী,
মনে নাই। ফুলগন্ধী চঞ্চল চিকুর
পারিজাতস্পর্শ দিয়ে রোমাঞ্চবিধুর

বিবশ করেছে তনু। দুটি বাহুলতা
হৃদয়ে জড়ায়ে ল'য়ে এই ক'টি কথা
কহিলাম মনে পড়ে, 'এখনি কি প্রিয়ে,
যাবে তুমি ? নিশিভোরে যায় নি নিবিয়ে
তারার প্রদীপ।'

জেগে দেখিলাম আমি,
শুক্লচতুর্দশী-চাঁদ অস্তপথে নামি
যায় ধীরে। হাস্‌নুহানা তখনো বাতাসে
সুগন্ধ ছড়ায় মুঠি-মুঠি। নাই পাশে
স্বপ্নাভিসারিণী বধূ। কী ভুলে না জানি
শয্যাতলে গেছে ফেলে খণ্ডজ্যোৎস্নাখানি।

বালিগঞ্জ
২৯ মাঘ ১৩৫০

ভালোর চেয়ে যা ভাই মন্দ

দা-কাটা তামাকের গন্ধ,
গড়িয়ে পড়বার খানাখন্দ,
ভালোর চেয়ে যা ভাই মন্দ
কেবল মাত্র প্রাণধারণের সর্তে
'অনেক-পাইনি'র দেশ আমাদের মর্তে
সব পেয়েছি ; এখান থেকে যেদিন হবে সরতে
(হিন্দু হলেই শ্মশানশয্যা, ম্লেচ্ছ হলেই গর্তে)
ছেড়েই যেতে হবে, তাই রে
উঠতে বসতে ঘরে বাইরে
বেদন পাই রে মনে বেদন পাই রে।
হু হু ক'রে আসে কেবল কান্না।

জামার হাতায় মুছে দেখি, জলের চিহ্ন নাই রে।
মনের কষ্ট মনই জানে ; অন্য জনে করেন রান্নাবান্না
মেয়ে হলেই, পুরুষ কিন্তু
আপিস্ করেন, চাকরি করেন,
(মেয়ে হলে মাকৃড়ি পরেন)
ফেরি করেন, ব্যাবসা করেন, মোটেই সময় পান না—
কে কাঁদে আর কে হাসে তার খবর জানতে চান না।

তবু এ সব সত্য কথাই, কোরো না কেউ সন্দ—
পানাপুকুর, পচা ড্রেনের গন্ধ,
গড়িয়ে পড়বার মতন খানাখন্দ,
(পূর্ণিমা আর ভাগ্যে কয়টা) রাহুগ্রস্ত কিম্বা ভগ্ন চন্দ,
ভগ্নজীবন-ছন্দ,
ভালোর চেয়ে সংসারে যা মন্দ,
ছাড়তে দুঃখ হয় রে।
দুঃখ জীবনবন্ধ মুখ্য,
বেঁচে থাকার নামই দুঃখ,
দুঃখ ছাড়তে তাই তো দুঃখ হয় রে—
হায়, এ কেবল বাক্‌চাতুরী নয় রে।

নিরালম্ব বায়ুভূত কিম্বা দিগ্‌বিলীন,
নাই রে রাত্রি, নাই রে ও যার দিন,
মহৎ হয়তো তেমন সত্তা, কিন্তু তার তো নাই রে চক্ষু-নাসা—
নাই রে শঙ্কা আশা,
নাই রে সর্বনাশা প্রণয় অর্থাৎ ভালোবাসা
এবং মিথ্যা মরীচিকার পিছন পিছন ধাওয়া
এবং কারণ না থাকলেও হঠাৎ হুঁচোট খাওয়া।

কলিকাতা
২৬ ভাদ্র ১৩৫১

ভবানীর ভোজবাজি

রামপ্রসাদী সুর

বাজিকরের মেয়ে, শ্যামা, যেমন নাচাও তেমনি নাচি—
আজব শহর কোল্‌কাতার এই এখন চৌতালাতেই আছি।
বাসার অভাব, নামতে নামতে
কোথাও কেন হবে থামতে ?
ভয়ে ঢুকব ঘামতে ঘামতে
আঁধার গর্তে, এমন-কি শোন্‌ ইঁদুর-গর্ত পেলেই বাঁচি।
আজব শহর কোল্‌কাতার এই এখন চৌতালাতেই আছি।

জল্‌জেয়ান্ত মানুষ যারা যুদ্ধে লক্ষ হাজার মরে,
আমরা মরি ম্যালেরিয়ায় ওলাউঠোয় সর্দিজ্বরে।
বুল্‌বুলিতে খেয়েছে ধান—
দোষ কারও নয়, বিধির বিধান।
ক্রীপ্‌স্‌ করবে কী সমাধান
রাজনীতি আর ধর্মনীতি দুই সতিন না মিললে পরে।
মিলবে স্বরাজ থাকলে বেঁচে অন্নাভাব আর কম্পজ্বরে।

বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমন নাচাও তেমনি নাচি—
রুদ্রনাচন নাচিয়ো না মা, আমরা নেহাত মশামাছি।
মেঘ-ঢাকা আজ নীলাম্বরে
বজ্র বাজে কড়াক্কড়ে,
চাল উড়ে যায় প্রলয়-ঝড়ে—
সাধের ঘুম বা যায় ছুটে যায় বড়োই ভয়ে ভয়ে আছি।
রুদ্রনাচন নাচিয়ো না মা, আমরা নেহাত মশামাছি।

কলিকাতা
২৬ ভাদ্র ১৩৫১

লক্ষ টাকার স্বপ্ন

রামপ্রসাদী সুর

লক্ষ টাকার স্বপনটারে নিতান্ত, মন, করবে মাটি ?
চিৎপুর এবং চাঁদ্‌নি-বাজার করো কেবল হাঁটাহাঁটি !
ছিন্নকন্থা হায় কী মন্দ !
হয় না তোমার তা পছন্দ ?—
নিশিদিবস সেই তো ধন্দ
মিলবে কোথায় তোষক বালিশ মশারি আর শীতল-পাটি।
লক্ষ টাকার স্বপনটারে নিতান্ত কি করবে মাটি ?

ওরে অবোধ, ঘুম যে ভালো নিঠুর জাগরণের চেয়ে—
দোলায় গজমোতির মালা কণ্ঠে পরীরাজার মেয়ে।
জেগে থাকলেই ক্ষুৎপিপাসা,
দুঃখশঙ্কা, সুখের আশা,
মাসান্তে ভাই চোকাও বাসা-
ভাড়া এবং মহাজনের চরণপদ্মে পড়ো যেয়ে।
ছেঁড়া কাঁথাই তোমার ভালো ধারের মাল ঐ গদির চেয়ে

কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে প'ড়ে কিন্তু রইবে পিছে—
উপরেতে তুমিই চড়ো, কেউ না কেউ তো রইবে নীচে।
তার চেয়ে শোন্ সুযুক্তি শোন্,
ছেঁড়া কাঁথায় দেখ্ রে স্বপন।
আগুন লাগুক, ক্ষতি কী, মন—
পিপু-ফিশু'র জীবনবৃত্ত আদ্যোপান্ত সব কি মিছে ?
কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে কারে তুমি ফেলবে নীচে ?

কলিকাতা
৩০ ভাদ্র ১৩৫১

স্বপ্ন

কালকে ছিল এমন সরেশ রাত
আকুল ধারে এমন বারিপাত,
স্বপ্ন যদি মনোমোহন বেশে
সামনে এসে হাসত অকস্মাৎ
সত্য ব'লেই মেনে নিতেম আর
কথা কইতেম দু-চারটে তার সাথ।
কালকে ছিল এমন বাদল রাত!

ঈষৎ একটু ছিলই অসুবিধে—
কোন্ মূরতি ধরবে স্বপন
কেবল তারই জবাব নেইকো সিধে।
ঐ যা অসুবিধে।

ঝরো ঝরো বাদল ঝরে বাইরে।
স্বপ্নে এমন মালুম হল ভাই রে
চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, দিল্‌খুশে
গান জুড়েছি তাইরে-নাইরে-নাইরে
সা-রে গা-মা পা-ধা নি-সা'র
সাত সীমানার একেবারেই বাইরে—
আপিস যেতে হবে না আর, তাই রে।

জেগে দেখছি অনেক অভাব, অনেক খিটিমিটি।
জেগে ভাবছি স্বপ্নে-লেখা পদত্যাগের চিঠি
গ্রাহ্য না হয় শেষটা।
নিতান্ত বদ কালটা এবং দেশটা—
ভোরের স্বপন না ফলে যায় শেষটা!

কলিকাতা
২৫ শ্রাবণ ১৩৫২

'পরিস্থিতি'

সিত গজদন্তের উচ্চ মিনার
চুমিছে নীলোজ্জ্বল গগনকিনার,
সেখানে বাঁধব বাসা হেন আশা নাই।

জনক বা পরাশর রোডে যদি পাই
পায়রা-খোপের মতো ঘর দেড়খানা
দ্বিতলে বা তিন-তলে, বাক্স-বিছানা
বেঁধে ছেঁদে, ট্যাক্সি বা ঘোড়-গাড়ি ডেকে
ধাই যে উপস্থিত আস্তানা থেকে
পড়ি আর মরি।
সিত গজদন্তের চূড়া, হরি হরি,
কোথাও পড়ে না চোখে যে দিকেই চাই।
আকাশে বাঁধব বাসা হেন আশা নাই।

পায়রার খোপ মানে কপোত কপোতী
দুজনের কূজনের স্থান, সম্প্রতি
এমনটি না হলেও চলে।
পায়রার খোপ মানে দিশেহারা হলে
কৌচ আর কেদারার গোলক-ধাঁধায়
হুঁচোট খেতেই হবে ; কোনো সন্ধ্যায়
(খেটে খেটে দশ থেকে পাঁচটা অবধি)
আপিস-ফের্‌তা তুমি ক্ষেপে যাও যদি
ঘরে বা বারান্দায় দিতে পারো ছুট
জোর বিশ ফুট—
না হলেই বাস্তবে মস্তক ঠুকে
জ্ঞান হবে থেঁৎলিয়ে নাসা ও চিবুকে
ঘোড়দৌড়ের মাঠ এটা নয় ঠিক

(আনাচে কানাচে পাছে আছে পব্‌লিক)—
মনে হবে, সুসভ্য গোটা ফ্ল্যাট্‌খানা
কংক্রীট গাঁথুনির মানা একটানা।

তা হোক। জানলা খুলে আকাশ আলোক
কখনো তো ঘর ঢোকে। ছুটে যায় চোখ—
তেল-কল ঘেঁষে ঐ যেথা গুল্‌মোর
রক্তরাগের মদে বেহুঁশ বিভোর
পাপড়িতে ঢেকে দেয় রাস্তার ধুলো;
যেন বরযাত্রী রে দেবদারুগুলো
কচি সবুজের সাজে করে ঝল্‌মল্‌,
রৌদ্র ছিটিয়ে খেলা করে চঞ্চল।

এমন দিনেই যদি কাজে থাকে ছুটি,
সুরভি চায়ের সাথে মোরব্বা রুটি,
তাম্রকূটের কটু ধূম,
দিবসের এই পারে
চাই নে অন্য কারে—
চাই নে অন্য কোনো আকাশকুসুম।

শনিবার বৈকালে আড্ডা ও গল্প—
দেদার চায়ের পাট, শর্করা অল্প।
নিরিবিলি রবিবার, হাঁপ-ছাড়া স্বস্তি—
সচ্চিদানন্দের অন্তত 'অস্তি'
বোধে বোধ,
রোক্‌শোধ,
আর কিছু চাই নে।
সপ্তাহে একদিন বাধা যেন পাই নে
খেয়ে-দেয়ে ঘুম দিতে। বাড়ুক-না মাইনে

বৎসরে একবার। বেশি কিছু চাই নে।

ভৃত্য হয় গো যদি
রন্ধনে দ্রৌপদী
(বহুস্বামিত্বে নয় নয়)
(সকল-কর্মা যদি হয়)—
হিসেবের গর্‌মিল হয় হোক দৈবে,
অথবা নিত্য হোক, অক্লেশে সইবে ;
বাজার-বজেট নিয়ে বিতর্ক চাই নে—
বৎসরে একবার বাড়ে যদি মাইনে,
জমা ও খরচ মেলে বাঁয়ে আর ডাইনে।

সিত গজদন্তের উচ্চ মিনার
কোথায় উঠেছে ফুঁড়ে গগনকিনার,
সেখানে বাঁধব বাসা হেন আশা নাই

স্থূল দুঃখের কথা শুনবে কি ভাই ?
ভোজন তো যথাতথা, শয়ন তো হাটে,
নানান গণ্ডগোলে দিনগুলো কাটে,
পরাশর রোডে যদি বাসাটা না পাই
মরণে গঙ্গাতটে শান্তি কি ছাই
মিলবে দগ্ধভালে জানেন ধাতাই—
তাইরে নাইরে তারে নাই।

কলিকাতা
শ্রীপঞ্চমী ১৩৫৩

রাজকন্যা

জানি নে রাজকন্যে
জেগে কিম্বা ঘুমিয়ে আছে রাজকুমারের জন্যে
সাত-সমুদ্র তেরো-নদী তেপান্তরের শেষে
অস্তশৈল পেরিয়ে নতুন উদয়-রবির দেশে,
মিলন যেথায় শুভ্র মেঘ আর শুভ্র প্রাসাদ-কূটে,
দিগ্‌বধূদের দৃষ্টিপাতেই হুলুধ্বনি উঠে
অনাগতের আশায় স্মিত শান্ত দিগ্‌বিদিকে,
মন্দাকিনীপবন এসে ফুল্ল মাধবীকে
দোল দিয়ে যায়, পূবের পানে জান্‌লাখানি খোলা,
শুকতারা আর গৃহকোণের দেউটি আপন-ভোলা
হেসে চায় গো পরস্পরে— রাজকুমারের জন্যে
জেগে কিম্বা ঘুমিয়ে সেথায় বিরলে রাজকন্যে।

রাস্তাতে ভিড় ঠেলে
ঘুরে বেড়ায় মন্ত্রমুগ্ধ হেথায় রাজার ছেলে।
ধনের তৃষ্ণা, মানের তৃষ্ণা, দেহের তৃষ্ণা ছাড়া
সকল কথাই ভুলেছে, তাই, হায়, ও আত্মহারা
লক্ষশত ছায়ার সঙ্গে ছায়া হয়েই আছে;
ধূ ধূ শহর-মরুর মধ্যে নাই দূরে নাই কাছে
সুধার ধারা, নৃত্য করে কেবল মরীচিকা
দিগ্‌বিদিকে, মেলে লক্ষ বাসনার ঐ শিখা
দহন করে— যেথায় দর্মাহাটার হর্ম্যগুলো
আকাশ আড়াল করেই রাখে, ধূলোতে হয় ধূলো
প্রেমের স্বপ্ন, শোভার স্বপ্ন, স্বপ্ন আকাশ-ছোঁওয়া;
যন্ত্রদানব ফোঁষে কলুষ-কলঙ্ক-ময় ধোঁওয়া;
সোনা-মানিক তিসি-তামাক পাট ও তুলার পণ্যে
বিকিয়ে হৃদয় রাজার পুত্র ভোলে যে রাজকন্যে।

হায় সে রাজার কন্যে

রাজার কুমার না জানে তো জানবে কি আর অন্যে
তিলোত্তমার মতোই বিশ্বশোভাতে তিল তিল
ছেয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে— উল্লাসে ঝিল্‌মিল্‌
ঊর্মিমালায়, নারিকেলের চিকন-সবুজ পর্ণে,
ইন্দু তপন তারায়, ইন্দ্রধনুর বর্ণে বর্ণে,
আসার-আলোর চলচপল লীলাতে উদ্‌ভাসি
শরৎপ্রাতে, কান্নাধারায় ঝিকিয়ে অথির হাসি,
শোভার স্বপ্নে, সুখের স্বপ্নে, গানের সকল সুরে
শ্রুত কিম্বা অবিশ্রুত প্রাণের অন্তঃপুরে,
প্রাণের গহন চেতনারই তারায় তারায় খচি
হিরণ-কিরণ-কান্তি রূপের আভাস রচি রচি—
কত-না যুগ-যুগান্তকাল রাজকুমারের জন্যে
ফুলের বাসর সাজিয়ে আছে হায় সে রাজার কন্যে।

দিনের পরে দিন

জীবন-খাতায় জমা খরচ খতিয়ে কেবল ঋণ
বেড়েই চলে, জড়িয়ে জটিল নিষ্ফলতার পাকে
মনে হয় কে কালের কারায় মানব-আত্মাটাকে
বন্দী করে রেখেছে, তার মুক্তি কোথাও নেই—
দম্‌কা হাওয়ায় জান্‌লা খুলে যায় যে মুহূর্তেই,
রবির অস্ত-উদয়-সীমা দক্ষিণ এবং উত্তর
সকল দিকই খোলা দেখে আমিই যে রাজপুত্তর
মনে পড়ে ; সীমাশূন্য আকাশ দিকে দিকে
বিছিয়ে আছে আমার আমন্ত্রণের পত্রটিকে ;
আমার বধূর দ্যুতিমুখর বাণী যে উজ্জ্বল
তারায় তারায়, অশ্রুহাসিমিশ্রিত ছল্‌ছল্‌
প্রেমের বাণী : হে রাজকুমার, কেবল তোমার জন্যে
জান কি যুগ-যুগান্তকাল জাগছে রাজার কন্যে ?

ওগো রাজার কন্যে,
নীলের অকূল হতে এল আলোর আকুল বন্যে।
তারও উর্ধ্বে কোথায় তুমি অলোক কমল ফুটে,
মনের মধুপ নাগাল পায় না ; কালের বাঁধন টুটে
যায় না আমার, হাসির ছলে যেথায় লোকান্তরে
নিমেষ-সনে অনন্তকাল মালা-বদল করে,
পলক-হারা জানি যেথায় নয়ন-দুটি তব
তিমির-ভেদন প্রেমের বেদন -পূর্ণ অভিনব
শুক্‌তারকা, প্রাণ-ঝরোখা খোলা যে কার জন্যে—
জাগর-স্বপ্নে ধেয়াই গো তাই ওগো রাজার কন্যে !

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৪ ফাল্গুন ১৩৫৩

আমার কবিতা

আলোকের লতা
তারকার পুঞ্জে পুঞ্জে মুঞ্জরিত,
আলোকেরই কথা
দিগ্‌বধূর কানে কানে গুঞ্জরিত তার—
আমার কবিতা।

শর্বরীর তমিস্র -মগন,
ধ্যানে তার উদয়লগন,
অন্তরেতে নিরন্তর উদিত সবিতা—
আমার কবিতা।

শান্তিনিকেতন
ফাল্গুন ১৩৫৩

চঞ্চল

ও যে নীল আকাশের হৃদ্‌বিহারী
চঞ্চল ! চঞ্চল !
করে হাওয়ায় হাওয়ায় আসা যাওয়া—
ধূলির ধরাতল
তারই দূর নিশাসের আভাস লেগে
হিমের বাঁধন টুটে উঠল জেগে,
অধীর ফুলের ঝড়ে কী আবেগে
তাই বন'অঞ্চল
চঞ্চল। চঞ্চল।

১৩৫৪

প্রার্থনা

ঊর্ধ্বে তুলেছ ধরে চেতনার অঞ্জলি
বন্ধু আমার—
ক্রন্দসীবিগলিত অজস্রধার
জ্যোতির প্রবাহে দাও ভরে।
দু চোখে ধরে না আলো। হে বন্ধু, মোরে
নীলাকাশউৎসুক উন্মুখ ফুলে
বারেক ফুটায়ে তোলো। ভূমি হতে তুলে
লও মোরে, তোমা-পানে তুলে লও মোরে—
আলোকপীযূষে ভরে দাও,
জ্যোতির প্রবাহে দাও ভরে।

আশ্বিন ১৩৫৫

অপরাজিতা

অপরাজিতার ফুলে
মধুপ হৃদয় ভুলে।
বায়ু বহে দূর দিগন্ত হতে,
আলোকধৌত সে খুশির স্রোতে
আঙিনাসীমার সবুজ-গহনে
ওঠে ঐ দুলে দুলে।
অপরাজিতার ফুলে
ভ্রমর হৃদয় বুলে।

শিশিরধৌত কোমল দলের
নীলঅঞ্জলিপুটে
নীলাকাশ ভরি উঠে।
প্রথম প্রাণের নয়ন-ভুলানো
প্রথম প্রেমের তূলিকা-বুলানো
অনিন্দ্য রূপ, প্রথম উষার
পুলকে উঠেছে ফুটে।
নীলাকাশ আর নিখিল আলোক
আজও ভরি ভরি উঠে
ফুলঅঞ্জলিপুটে।

তারার কুহরে কুহরে যে স্বর
অকূল আকাশ-মাঝে
নীরব নিশীথে বাজে,
আলোকের বীণা বাজে যেই স্বরে
সবুজে-সোনায়-বান-ডাকা দূরে
অবিচল তনু মন ওঠে পূরে
সেই স্বরে, সেই সাজে

দেখা দিয়েছে গো এই অপরূপ
শরৎপ্রভাতে আজ এ
আমারই আঙিনা-মাঝে।

আকাশে লাগে না কালো কলঙ্ক
কামানের ধূমে ধূমে।
শোণিতসিক্ত ভূমে
শ্যামলতা পুন ছায় তৃণে তৃণে,
শিশিরপংক্তি শোভে আশ্বিনে।
দ্যুলোকদেবতা অরুণআলোর
চন্দনে কুঙ্কুমে
ললাট সাজায়ে লাজুক ফুলের
ফুল্ল অধর চুমে
ধূলিময় ধরাভূমে।

আঙিনাসীমার সবুজ-গহনে
অপরাজিতার ফুলে
মধুপ হৃদয় বুলে।
কলঙ্কহীন অপরূপ রূপে
দ্যুলোক ভূলোক ভুলে
অপরাজিতার ফুলে।

শ্রীনিকেতন
২৪ আশ্বিন ১৩৫৫

শরৎপ্রভাত

সুনীল আকাশ ঝরে
কুঞ্জবনের পথে পথে
অরুণ রজে, সবুজ তৃণস্তরে,
শাল-মহুলের ফাঁকে ফাঁকে
আলোর ঝড়ে ঝড়ে,

মুগ্ধ বনের পাতায় শাখে,
শিশিরিত ফুলের ফুল্লাধরে।

আজ আলোকবীণার অরূপ তন্ত্রী
টুটবে বুঝি অধীর রাগের ভরে।
সুনীল আকাশ ঝরে
শরৎপ্রাতে প্রাণের 'পরে,
আমার গানের 'পরে।

শ্রীনিকেতন
২৫ আশ্বিন ১৩৫৫

শারদা

ভারহীন শ্রীচরণ আলোকের কনককমলে,
বর্ষণধারা-ধোওয়া নবনীল অম্বরতলে,
অলোকলক্ষ্মী অয়ি আলোকপ্রতিমা,
(ঝলোমলো ঝলোমলো দশ দিক্‌সীমা)
কলরবহারা কাল-সিন্ধুর স্রোতে
কোন্ কূলে ভেসে চলো কোন্ ঘাট হতে—
অলক্ষ্য তনু তোর তনুরই আলোকে,
রূপ তো পড়ে না ধরা চোখে,
মন মূরছায়
হায়!

নিম্নে ধরণীতলে নবীন ধান্যে ওঠে দুলে
দিগন্ত হতে দূর দিগন্তকূলে
শ্যামসিন্ধুর ঢেউ, উলসিত কাশ-ফুলে ফুলে
চমকে শুভ্র ফেনচয়—
শেফালি-মালতী-যূথী-নিখচিত অরণ্যময়
আজি বনলক্ষ্মীর ছায়ার আঁচলে,

অলোকলক্ষ্মী, তোর জ্যোতির খণ্ডগুলি ঝলে
লীলাস্খলিতমণিবিভূষণরাজি—
আলোকআকুলপ্রাণ পাপিয়ার গান ওঠে বাজি
সচকিত পঞ্চমে, ঊর্ধ্বে উধাও সেই স্বরে
সুরের কুসুমগুলি তোমারই চরণে থরে থরে
বিছাইতে চায়
হায়!

অয়ি শাশ্বতী উষা, অনন্ত-পানে
স্বর্ণকমলে ভেসে চলেছ কে জানে
কার অভিসারে।
শ্রীঅঙ্গদ্যুতি তব জ্যোতির প্রহারে
নিমেষে জাগায়ে দেয় অহেতু করুণা করো যারে,
চকিতে যায় যে সরি
অমাবিভাবরী,
আলো-কমলের তব অনন্ত দল
বিকশিত বিহসিত ঢাকে হৃদিতল,
আলোকের মধু ঝরে, আলোর পরাগে
সুরভিত তনু মন, চেতনায় জাগে
তোমারই দিব্যরূপ আনন্দময়—
এ আকাশে এ আলোকে হেথা নয় নয়:
কালসিন্ধুর স্রোতে চলিয়াছ ভেসে
কালের অতীতে তুমি কার উদ্দেশে
অলোকলক্ষ্মী অয়ি আলোকপ্রতিমা!
ঝলোমলো ঝলোমলো হৃদয়ের দশ দিক্‌সীমা
আলোকে ও চেতনায়,
নয়নে পড়ে না ছবি,
মন মূরছায়
হায়!

২৬ আশ্বিন ১৩৫৫

ছবি

সজলকজ্জলরাগ অশ্রুভরা মেঘে
দিগ্‌বলয়। বনশ্রেণী তারই ছায়া লেগে
গাঢ়নীল বাষ্পে ঢাকা। স্থিরশিহরণ
নবীন ধান্যের ক্ষেত শ্যামলবরণ
নতোন্নত ধরণীর দূর হতে দূরে
ঊর্মিশিহরিত হেথা সরসীমুকুরে
হর্ষকণ্টকিততনু খর্জুর, গম্ভীর
তালতরুচ্ছবি কাঁপে। কাকচক্ষু নীর
ভেদ করি কোকনদ কহ্লারের ফুল
হাসে সেই সাথে সাথে। সহসা ব্যাকুল
উড়ে পড়ে মাঠ হতে ঘাট হতে বক
শুভ্রপক্ষআন্দোলনে হানিয়া চমক
সাশ্রুনীল দিক্‌পটে। মনে হয়, কবি-
কল্পনার এ পৃথিবী ; সত্য নয়, ছবি।

শ্রীনিকেতন
২৭ আশ্বিন ১৩৫৫

মনে ছিল আশা

বহুদিন মনে ছিল আশা
ভরা গঙ্গার তটে বেঁধে নিব বাসা।
ভাঙা ঘাটে সোপানের 'পরে
কোনো লঘু চরণের চিন্‌ না'ও পড়ে
শ্রাবণে মালতী আর
শরতে শিউলিফুলদলে
ঢেকে দিবে শ্যাওলার স্নিগ্ধ সবুজ :
ঢেউগুলি মৃদু কলোকলে

ধীরে ধীরে তীরে তীরে ফিরে ফিরে জেগে
জোয়ারের বেগে
সোনার প্রভাত মোর সিঁদুর গোধূলি
বুকে নিবে তুলি—
ঝরা মালতীর ফুল,
করুণ শিউলি,
আর অকারণ কোন্ পথ-চাওয়া মানসের ভুল—
ভেসে যাবে, হেসে যাবে সুনীল মরণে
তলহীন উচ্ছল যেখানে অকূল
বুক থেকে লুটে নেয় ভীরু ভালোবাসা
মুখ থেকে ভাষা।
বহুদিন মনে ছিল আশা।

১৩৫৯

এ গান আমার

এ গান আমার
কার তরে গাই নিশিদিন ?

বনে উপবনে যবে ফাল্গুন নবীন
ধ্বনিহীন মায়ামন্ত্র পড়ে,
সুদূরদক্ষিণাগত
মলয়জ-জোয়ারের শিখরে শিখরে
নিরুদ্দেশে
কোথা যায় ভেসে !
ফাল্গুনে যেদিন
লঘুমেঘে অস্তোদয় রবির রঙিন,
প্রস্ফুটপ্রসূনসুরভিতে
দিগ্‌ভ্রান্তমধুপ-হেন ফিরে মুগ্ধচিতে
কাননবীথিতে।

হায় রে আমার গান আসে ফিরে আসে
ক্ষুরধার উত্তরবাতাসে
অতি দীর্ঘ পউষের রাতে
শূন্য এ হিয়াতে
নিশাচর পাখিদের সাথে
আশ্রয়বিহীন।

এ গান আমার
কার তরে গাই নিশিদিন ?

ঝাঁঝা
২৮ পৌষ ১৩৪৫

সহমরণের বধূ

সহমরণের বধূ এ গান আমার
অনুরাগবতী
সেবা ও সোহাগ দিয়ে সতী
রাতে আর দিনে
বেঁধেছে অপরিশোধ আনন্দের ঋণে
নগণ্য আমারে।
মুখে ল'য়ে বুকে ল'য়ে তারে
জনারণ্য সংসারের এই এক ধারে
কত কাল আছি !
আমি ভালোবাসিয়াছি
আমার এ গান।

উৎকর্ণ হৃদয়ে যবে মৃত্যুর আহ্বান
উত্তরিবে শেষে
এরে নিয়ে যাব আমি নূতনের দেশে
ভালোবেসে

এই অভিমান।

সহমরণের বধূ আমার এ গান।

ঝাঁঝা
২৮ পৌষ ১৩৪৫

৩

প্রথম ও দ্বিতীয় রচনা বাদে
এই অংশের সবই গদ্যছন্দে।

সদরআলা'র

সেফ্‌টিপিন-বিভ্রাট

একটি দিন
সেফ্‌টিপিন
হারিয়ে হায় লেট টিফিন,
হয় না গলায় টাই আঁটা!
নীচের তলায়, ভাই, ঝাঁটা—
দৌড়ে আন্‌ তো।
রমাকান্ত
দরোয়ান তো
জমায় ভালো হাঁক-ডাকে—
গুম্ফধারী ডাক্‌ তাকে।
দৃষ্টি রাখ্‌।
ডাক্‌ রে ডাক্‌
সত্যনারাণ! পীর-বদর!
হারিয়ে-ফেলা পিন-কদর
বুঝবে কে—? হায় সদর-
আলাই বুঝবে,
বাড়ির তিনটে তালাই খুঁজবে—
জীবনযুদ্ধে নইলে যুঝবে
ক্যায়্‌সে?
কেমন ক'রে আটক ফাটক ফাঁসির হুকুম দেয় সে?
গলাতে টাই
যখনই নাই
কী গণ্ডগোল এজ্‌লাসে!
চৌকি চেয়ার মেজ হাসে!
জানলা কপাট বেঞ্চ্‌ হাসে!

এ. আর. পি'র ওই ট্রেঞ্চ্‌ হাসে
বাইরে ভাই,
'সদরআলার কণ্ঠে টাই
নাই রে, তাই
তাইরে নাইরে নাইরে নাই !'
হাসে উকিল মোক্তার,
আদার দালাল আর ব্যাপারী দোক্তার
আবার যারা লোক তার—
পিন হারায়ে শোক তার
ভুলতে পারা তাই কঠিন !
তামাম রাত তামাম দিন
খোঁজ্‌ খোঁজ্‌ খোঁজ্‌, খোঁজ্‌ ওরে পিন……
খোঁজ্‌ তো ইঁদুরগর্তে !
সেই বা কেমন সর্তে
পিন নিয়ে ছুট ?
পরি তো স্যুট,
টাই প'রে নিই, করব সমুদ্‌ব্যস্ত
রায় লিখে তায় এম্‌নি জবর্‌দস্ত—
করব বন্দোবস্ত
কড়া আইন কড়্‌কড়াকড়্‌ করতে।
(আইন-সভার কাজ কী আছে মরতে !)
ইঁদুরবংশ
করব ধ্বংস—
নাক গোঁজবার
রইবে না তার
ঠাঁই যে স্বর্গে মর্তে।

কী বল্‌লি ? পিন
সেফ টিপিন

বিলেত চীন
বোম্বাইয়ে কি মাদ্রাজে
লাগায় না কেউ এই কাজে ?
ঠিক রে ঠিক !
ধিক্ রে ধিক্ !
আগেই বললে, অহো কষ্ট,
হয় না তো আর সময় নষ্ট
(ঘণ্টা পাঁচের কম হবে ?)—
বেরিয়ে যায় না দম তবে,
রক্ষা করাই সম্ভবে।
এমন নিরেট বুদ্ধি তোর ?
কান ছিঁড়ে দিই আয় বাঁদর !

কলিকাতা
২৬ ভাদ্র ১৩৫১

দুধ খাও

শুনেছ কী বলেছেন শ্রীনলিনী সরকার ?—
দুধ অতি উত্তম, দুধ খাওয়া দরকার।
দুধ খেয়ে চোখে বাড়ে জেল্লা,
গায়ে এত জোর হয়
দেহ যেন দেহ নয়,
গড়খাই কেল্লা—
কী ভীষণ মজ্‌বুৎ।
পঞ্জাবী রজ্‌পুত
অদম্য যুদ্ধে
হাঁক ছাড়ে, ডাক ছাড়ে 'দুধ দে'।

বলেছেন এই শুনি মহামুনি চার্বাক,
টাকাকড়ি থাক্ আর নাই থাক্
খুব ক'রে দুধ খাও,

খুব ক'রে খাও ঘি।
দেখো ধার পাও কি।
আসল সুধে কী কাজ? সুদ দাও,
না'ই দাও, জাম্‌বাটী পেতে বলো 'দুধ দাও'।
পাঁচ সের, দশ সের— 'আরে আরে থাক্ থাক্'
যে বলে সে বীর নাকি? চার্বাক
বলে যা গেছেন শুনি মহামুনি তাঁর বাক্
(ম্লেচ্ছ যবন নই, আমরা তো আর্যই)
মান্‌ব না? বলছ কী! দুধ খাওয়া ধার্যই।
এই জেনো করণীয়, এই জেনো কার্যই।
পন্থা ন বিদ্যতে,
মর্ম কি ভিদ্যতে
ধর্মের এই বৈ?
অতএব দুধ কৈ?

আহারে ও অনাহারে গোরু প্রায় সবই শেষ।
ছটাক-খানেক দুধ থাকে যদি অবিশেষ
মণ মণ জল ঢেলে গোয়ালারা ঘর-ঘর
বিলি করে বেড়াচ্ছে— সত্বর
ছাঁক্‌নি ঢাক্‌নি আর ঘড়া ঘটি বের কর্।

কলিকাতা
২৯ মাঘ ১৩৫০

ছেঁড়া কাঁথায় লাখ টাকার স্বপ্ন

রোজ ডাল ভাত খাই, বড়ো বড়ো কথা ভাবি।
না জানি কত বড়োই হব একদিন—
কত বড়ো কথাই ভাবব।
হাসতে হয় হাসুন কৌতুকপ্রিয় প্রজাপতি
অলক্ষ্যে আড়ালে ব'সে।

চার জোড়া গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে
তিনি কি জেনে রেখেছেন ঠিক
চুরাশি লক্ষ যোনি-ভ্রমণ ভিন্ন
গতি নেই আর জীবের ?
দেখবেও না, শুনবেও না, ঠুলি-পরা কলুর বলদের মতো
বিশ্বকর্মার গড়া সৃষ্টি-ঘানিগাছের চারি ধারে
ঘুরে মরবে অনাদি অনন্ত কাল ?
দম-দেওয়া লাট্টুর মতো ফিরবে চতুর্দশ ভুবনে
অলক্ষ্য আকর্ষণে ;
আপনারও চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বলবে,
'আমিই পরাৎপর, আমিই সারাৎসার !'
থেমে যাবে যখন, কাত হয়ে পড়বে,
কী হবে গতি ? কবি যেমন বলেন
'লাট্টুর ঘায়ে লাট্টু ফাটায়ে'
ছুঁড়ে ফেলে দেবে নাকি কাঁটাবনে, কচুবনে ?

আপত্তি ছিল না !
কিন্তু, বাঁচতেই যদি হয়
ঘোরতর ঝগড়া হবে তোমায় আমায়
হে চতুর্মুখ ব্রহ্মা।
গাল পাড়ব না—
চার মুখের সঙ্গে পারব না ব'লে নয়,
চার মুখ থাকতেও তুমি যে বোবা।
উচ্ছন্ন যাব না, যদিবা সে লোভনীয়।
চোখ বুজে, নাক টিপে,
দম বন্ধ ক'রে, ডিগ্‌বাজি খেয়ে
মৎলব ভাঁজব না সৃষ্টি থেকে চোঁ চাঁ দৌড় দেবার।
ফল কী তায় ?
ভালো চোখে দেখব—
ভালো মনে পূজব—

ভালোবাসব—
যদি দাও এককণা ধুলো, একটু মাটি,
একটা কাগের ছাঁ বা বগের ছাঁ,
একটা ভিখিরি ছেলে,
একটি খ্যাদা মেয়ে
(রসকলি-কাটা রূপসী যদি জোটে পথের সঙ্গিনী
বিশেষ আপত্তি আছে যে তা নয়)
অথবা জনেক কুষ্ঠগ্রস্ত······
(দোহাই ! জানো তো বিধাতা ?
তোমার চেয়ে কেই বা জানে—
সকলের সব প্রার্থনায় কান দিতে নেই ।)

দাও-না।
জীব তো নয় জলবিম্ব, জীবন তো নয় হাওয়া—
হাওয়ায় মিশে যাওয়াই যার পরিণাম।
ভালোবাসার সুধাসিঞ্চনে
মানুষ হয় দেবতা, ধুলাই হয় স্বর্গ,
চিরবাঁধনের চিরমুক্তিতে নেচে ওঠে, গেয়ে ওঠে সৃষ্টি—
সত্য হয় তোমার স্বপ্ন হে কবি

ভাণ্ডারহাটি। আরামবাগ
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

আষাঢ়ের একটি দিন

মেঘ কেটে গেছে—
দু দিন পরে বিকালে আজ
সোনামুখী রোদ হেসেছে
গাছে-পালায়, ঘরে-দুয়োরে,
শহরের বড়ো রাস্তায়, অলিতে-গলিতে

এমনি সুন্দর বেলাশেষের স্বর্ণসুধা পান করে মাতোয়ারা
কতকাল কত মুগ্ধ চোখ
পৃথিবীকে প্রথম চিনেছে সুন্দরী শোভনা জননী ব'লে।
খোলা জানালায় বেঁকে পড়েছে আলো,
কাজ বাকি সংসারের,
অর্থহীন খেলায় মেতেছে মায়ে পোয়ে।
পথের ধূলোয় ব'সে ভিখারি,
ধূলিমলিন শতছিন্ন বাস,
হাত পাতে নি ভিখ মাগতে, কী জানি কী ভেবে।
বুড়োদাদাকে ঘিরে উচ্ছলিত কৌতুকে নাতি-নাৎনির দল
হাততালি দিয়ে নেচেছে, হেসেছে কলকণ্ঠে—
বয়সের বোঝা ফেলে বুড়োর মন
সেই সঙ্গে নেচেছে শিশু-হেন।
মেয়েরা জল ফেলে জল আনতে গেছে ঘাটে।
আলো ঝিল্‌মিলিয়ে আলো ঝিল্‌মিলিয়ে
কেঁপেছে গাছের পাতা।
প্রজাপতি বসে নি ফুল্লফুলে,
উড়ে বেড়িয়েছে লক্ষ্যহীন!
এমন দিনে কত কবি
পরীলোকের স্বপ্ন দেখেছে জেগে জেগে—
ছন্দে গেঁথেছে অলৌকিক সুখ, অলৌকিক দুখ,
অলৌকিক প্রেমের অলৌকিক বেদনা,
উপমায় অলঙ্কারে নিক্বণে সুরে
অপরূপা কবিতার চরণে চরণে বেজেছে পথ···
সে কি এই জগতের?

আজ কল্পনা পেয়েছে মুক্তি।
কবিতা হেঁটে চলেছে শহরের রাস্তায়।
কথার বাঁধুনি, ছন্দের বাঁধুনি, চিরাচরিত রীতি
সকলই রইল পিছনে প'ড়ে।

মায়াকাজল চোখে না লাগিয়ে রূঢ় দিনের রূঢ় আলোকে
আজকের দেখা, কালকের দেখা,
অনুভব-ভাবনার সোনামুঠি আর ধূলোমুঠি—
তাই দিয়ে রচব গান।
তাই দিয়ে রচব কবিতা।
প্রত্যাশা করব না কিছু ক্ষণিক রচনাসুখ ছাড়া
খ্যাতি বা প্রশংসা—
অপরূপকে রূপ দেওয়া
অভাবিতকে ভাষা দেওয়া
সেই গর্ব, সে গৌরব।

মেঘ কেটে গেছে—
দুদিন পরে বিকালে আজ
সোনামুখী রোদ হেসেছে গাছ-পালায়, ঘরে-দুয়োরে,
শহরের অলিতে-গলিতে, বড়ো রাস্তায়।
ছোটো ছোটো ভাইপো ভাইঝি ছাতে লাগিয়েছে ছুটোছুটি।
(ভালো ক'রে কথা ফোটে নি আজও সব-ছোটোটির)
ছাদের এ কোণ থেকে ও কোণে রঙিন ঘুড়ির সুতোয়
ফাঁকা দেশলাইএর খোল বেঁধে টেলিফোঁতে কয় কথা
মাটির টবে গোটাকয়েক বেল জুঁই গাঁদা গোলাপ,
ফোটো-ফোটো একটি গোলক চাঁপা ;
বড়োটি এসে বলে 'ত্যাখো কাকা— '।
'নন্দনকানন বুঝি তোদের এইখেনে ?'
রাস্তা দিয়ে হেঁকে যায় 'বোম্বাই আম' 'ল্যাংড়া আম' ;
ফুট্‌পাথের গাছের ছায়া আলোর চুম্‌কিতে খচিত হয়ে
খেলে যায় মলিন তার কেশে, বেশে, ফলের ঝুড়িতে।
মাঝে মাঝে এসে পৌছয় ট্রাম ;
জানলায় জানলায় অচেনা মুখ, কাঁচা পাকা, কিশোর যুবক, বৃদ্ধ—
নামে কেউবা এইখানে···

(বলব কি, এই ঘাটে ?
খেয়ানৌকো লাগে ভাগীরথীর এ পারে, ও পারে।
শ্মশান পার হয়ে,
জোড়াশিবের মন্দির ফেলে পিছনে
ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা আল-পথে
যায় কারা শিবপুরে স্থবীরপুরে
আম-জাম-বাঁশবনে-ঘেরা গাঁয়ে গাঁয়ে।
দেখতে ভালোই লাগে পাল-তোলা নৌকো,
পূর্ণ নদী, চূর্ণ আলো।
বকের পংক্তি উড়ে যায় আকাশের গায়ে গায়ে।
ঝুরি-নামানো বটের তলায়, ভাঙা ঘাটে
জল নেয় নতুন বউটি ; ঘোমটার ফাঁকে দেখে
সামনে বালুচরে ফুল্ল কাশবন বাতাসে উতলা।
জানি সব। কিন্তু এই কোল্‌কাতা শহরে
জনস্রোত চলেছে পথে পথে ;
যানস্রোত চলেছে দিকে দিকে ;
মানুষের চোখ দেখি তো মুখ দেখি নে,
কানে আসে নাম তো সংজ্ঞার্থ আসে না প্রাণে ;
কারও রঙিন উর্দি,
কারও চটুল চলা,
কারও পরম ব্যস্ততা,
কারও সর্বাঙ্গে বোবা হাহাকার—
চক্ষের নিমেষে জেগে চক্ষের নিমেষে আর নেই।
কত ভাগ্য ভাঙছে গড়ছে অবিরত এই তরঙ্গতাড়নে।
কত দুঃখ, কত সুখ, জাহাজ-ডুবি কত, কত নৌকাবিহার,
সংখ্যা আছে কি তার ? গণনা করে কেউ ?)

পাদচারী যুবক বেড়াতে চলেছে পার্কে (সহচর সঙ্গীরা আগে পিছে)—
বুক-খোলা পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে মাদ্রাজি চটি,
জানি নে মনে কী ভাবনা কী স্বপ্ন।

কখনো হাসিঠাট্টা ওঠে বন্ধুতে বন্ধুতে,
কখনো শিস দিয়ে চলে আপন-মনে ;
থমকে দাঁড়ালো নাম-না-জানা গাছের নীচে—
সোনার-বরন কঙ্কেফুলে কঙ্কেফুলে
বৃষ্টিতে আলোতে বিধৌত হাসি
ঐ বাড়ির হাতায় ছাপিয়ে উঠেছে ইঁট-কাঠ পাঁচিল পাহারা—
খোলা জানালায়
ভেসে আসে পিয়ানোর সুরে সুরে মিশে
কিশোরীকণ্ঠের সুধামধুর উচ্ছ্বাস।
অন্য দিকে এ বাড়িটায়
বারান্দা থেকে ঝুলছে খয়েরীপাড় খদ্দরের শাড়ি,
থেকে থেকে পালট খাচ্ছে খাম্‌খেয়ালি হাওয়ায়।
আমার এই জান্‌লা থেকে চোখে পড়ে না বেশি দূর ;
মাঝে মাঝে আড়াল করে ফুট্‌পাথের নতুন গাছগুলি।
প্রাচীন দিনের নারিকেল-কুঞ্জ
আকাশে জেগে উঠেছে দীঘল ভঙ্গীতে।
গড়িয়াহাট সড়কে সার-বাঁধা শিরীষ
মাথায় মাথায় ঠিক যেন নীলাভ পাহাড়ের ছবি
ঐ বুঝি দেখা যায় দূরে।
এ দিকে প্রসারিত নীলাকাশ—
মানা নেই আঁখিপাখির অবাধ আনন্দে উড়ে যেতে।

ধন্য এই বিকাল বেলা!
ধন্য এই আকাশ! ধন্য এই শহর!
ধন্য এই তাল নারিকেল শিরীষ সহকারের মেলা!
ধন্য মানুষের চেষ্টা, ধন্য মানুষের চিন্তা!
জটিল হয়েছে বটে সভ্যতা,
হারিয়েছে সহজ শ্রী, হারিয়েছে সহজ শুচিতা,
তবু তো ঠেকে নি কোনো সীমায়—

পৌঁছয় নি কোনো শেষে—
হাজার তারের বীণায় অশেষ আয়োজন চলেইছে সুর বাঁধার।
বাঁধা হলে পরে ঝংকার দিয়ে উঠবে যেদিন
মানুষের এই বীণা,
মানুষের এই সমাজ
মানুষের এই সভ্যতা
মিলে যাবে বনের সবুজে আর আকাশের নীলিমায়।
মিলে যাবে দিনের আলোয়; রাতের তারালোক
ঝংকৃত হবে সাথে সাথে অনন্ত দূরের থেকে
আনন্দে, বেদনায়।

বালিগঞ্জ
২২ আষাঢ় ১৩৪০

আষাঢ়পূর্ণিমা

মেঘ স'রে গেল,
আষাঢ়ের সিতপূর্ণিমাকে
অনন্ত আকাশের স্থির নীলিমায়
স্বপ্নতরণী বাইবার মিনতি জানিয়ে গেল
আপনার নিঃশব্দ বিলয়ে।

পূর্বাকাশের কতকটা আড়াল ক'রে
ত্রিতল ইমারত উঠেছে, ভারা নামে নি আজও।
তারই অদূরে একক নারিকেলের
উচ্ছ্রিত পল্লবের সানন্দ কম্পনে
পূর্ণচন্দ্র উঠল তারা-ছিটোনো আকাশে—
অকৃপণ অকুণ্ঠ তার আবির্ভাব
স্বপ্নের সুষমাসম্পদ বিলিয়ে দিল হেসে হেসে।

নিতে জানল না এই হাল আমলের শহর।
ট্রাম চলল তার নীরস ঘর্ঘরে,

রাস্তায় রাস্তায়
বিজ্‌লীবাতি জ্বলতে লাগল জ্বালাময়ী দীপ্তিতে,
মাথা গুঁজে, মুখ বুজে পথিকেরা চলল যে যার বাসায়—
অদূর স্টেশনে অথবা রেল্‌লাইনের পরপার বস্তিতে।
কেবল একটা হাওয়া উঠল কোথা থেকে—
কোথাকার হাস্‌নুহানার লাজুক একটু গন্ধ
সুধাস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'বন্ধু!'
সে স্বর শুনল আকাশের চাঁদ,
হাসল আপন-মনে।

বালিগঞ্জ
২৪ আষাঢ় ১৩৪০

পাঁজরের প্রশ্ন

সেই আকাশে সেই তো সুন্দর সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত;
শুক্লপক্ষ-চাঁদের ক্রমউপচীয়মান সুধা
সেই তো যারে তারে বিতরণ আকাশধরিত্রীর স্বপ্নসংগমে;
তারার হিরণদ্যুতি পুলকে কাঁপছে;
সুস্থির নারিকেল-পল্লব দিনান্তআকাশে আবছায়া-ইশারায় আঁকা;
ম্লান জ্যোৎস্নায় বালুলীন মন্দস্রোতে কলধ্বনি নেই,
ক্বচিৎ ঝিকিয়ে ওঠে চোখে, মনে হয়—
প্রাণের কীর্ণ নুড়িগুলির উপর দিয়েই নীরবে বয়ে চলেছে;
বনপথে একলা পথিকের পায়ে পায়ে
ঝরা শুক্‌নো পাতা মৃদু আর্তিতে গুঁড়িয়ে যায়;
হয়তো জোনাকি চম্‌কায় শাখায় পল্লবে,
নয়তো প্রাচীন বটের কোটর-নির্গত পেচক অর্ধস্বগতস্বরে
থেকে থেকে একই প্রশ্ন করে রহস্যঘোরা অমারাত্রিকে;
গোলাপবাগের কানে কানে ঘুমের আবেশে কথা কয় ভোরের হাওয়া;
স্বপ্নাঙ্কিত চোখে গোলাপ-বালারা চায়,
সব তো শোনে না;
শুকতারা হাসে;

মেঘের পাড়ে পাড়ে স্বর্ণরেখা ঝিকিয়ে ওঠে ;
দূর্বাবনে মণিমুক্তার ছড়াছড়ি ;
মটরশুটির ক্ষেতে মধুপের আমন্ত্রণ ;
প্রথম পল্লীবধূর প্রথম ঘট
নিভৃত নদীর ঘাটে ভরে ওঠে যখন স্নিগ্ধ সলিলে
পাপিয়ার উল্লসিত পঞ্চম স্বর বাজে আকাশে ;
মল-পরা পা তুখানি বধূর
চলার মাঝে মাঝে অকারণ থেমে যায় ;
পথধূলায় সেই আলো সেই ছায়া
সেই তো আল্পনা এঁকেছে ক্ষণিক খেয়ালে।

অনন্ত তোমার মাধুরী, বন্ধু,
কাল যা ছিল ভুবনে আজও আছে—
উলঙ্গ বালকের ধূলিধূসর নটনে,
কিশোরের উচ্ছলিত হাসিতে,
পুরুষের প্রাণান্ত প্রয়াসে আর
রমণীর প্রাণারাম প্রেমে।
আমারই পঞ্জরাস্থি-ঘেরা বুকে শুধু
যে ছিল তোমার কবি, যে ছিল তোমার বন্দী,
যে ছিল তোমার বিহঙ্গ
সেই মরেছে।
এ ক্ষতিও সইবে বন্ধু ?
আজ থেকে অনন্তকাল
শূন্যে দোতুল্যমান রইবে এই খাঁচা ?
থাকবে না প্রাণ, থাকবে না গান—
পুরাতন প্রাণের বাসা— গানের বাসা—
প্রাণকে গানকে বিদ্রূপ করবে শুধু
নিষ্ফল আপনার অস্তিত্ব দিয়ে ?

বালিগঞ্জ
১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪০

শূন্য মৌচাকের মধু

ফুলে ফুলে ভিড় করেছিল যারা,
মৌচাক রচেছিল গুঞ্জনস্বরে,
কোন্ চৈত্রপূর্ণিমা রাতে
কবে
মধু পান করে উড়ে গেছে
কোন্ সিন্ধুতীরে
কোন্ শৈলসানুতে
আর-কোন্ চৈতী ফসলের শোভাসত্রে !

হায়,
শূন্য মৌচাক !

গোপন কি কোনো কক্ষায়
অক্ষয় মধু আজও সঞ্চিত ?
নিঃশব্দ নিশীথে যখন
ঘুমোয় বিশ্বসংসার
কী অমৃত ঝরে তাই
নিরিবিলি প্রাণে—
স্মিত তারা হতে ঝরে
হিরণ্ময় কিরণ অন্ধকারে

বালিগঞ্জ
১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪০

ঘুঘু-ঘূ

পূজোর ছুটি হল :
আশ্রম শূন্য ক'রে একে একে চ'লে গেল সব
মা-বাপ ভাই-বোনের টানে
ঘরের মায়ায় '

কত দূরে কত নদনদীর পারে
এখানকার আকাশে শুধু
যাওয়ার এক ব্যাকুল হাওয়া জাগিয়ে দিয়ে।
তারা নিয়ে গেল তাদের হাসির লহর,
শাড়ির ঝল্‌মলানি,
কলকণ্ঠের আলাপন।
নিয়ে গেল তাদের উৎসবরাত্রির গীতগুঞ্জন,
পূজা, পাঠ, আলোচনা।
কিছু রেখে গেল তবু নবজীবনের নবীন উদ্যম,
ললিত সুখ দুখ,
নিগূঢ় আশা ভয়
আশ্রমের শালবনে আমলকীবনে
পল্লবের কাঁপনে—
নিভৃত পথে পথে মালতী ও শিউলির
নিঃশব্দ পতনে—
তৃণে শিশিরে—
আলোয় ছায়ায়।

যে গেল সে গেল।
কাশকুসুমবীজিত
শ্যামলে সোনায় নীলে মর্মরিত-হিল্লোলিত
পরিপূর্ণ অবকাশের মর্মস্থলে ব'সে
কাঠে খোদাই করে চলেছি নতুন নক্‌শা।
বেলা দুপুর।
এমন সময় দ্বারের কাছে
লতাবিতানের সুশীতল ছায়াশ্রয় থেকে
উঠল অনুচ্চ কাকুতি :
ঘুঘু—ঘূ, ঘুঘু—ঘূ !
এক নিমেষে আকাশের সব আলো
অভূতপূর্ব একটি মীড়ে উদাস হয়ে গেল।

মুদ্রিত দৃষ্টির ধ্যানে নয়,
পরিচিত দিগন্তের আবরণ সরে গিয়ে
খোলা চোখের সম্মুখেই জেগে উঠল
মরীচিকাছবির মতো :
গিরিরাজ হিমালয়ের বিশাল শরীরে
বাঁকে বাঁকে লুকোচুরি খেলে
অধিত্যকা উপত্যকায় উঠে নেমে
অনন্ত নাগের মতো
পথ গেছে নিরুদ্দেশে
দেওদার কেলু আর ভূর্জ -বন পার হয়ে,
মেঘলোক ভেদ ক'রে,
আত্মবিলোপ করবে ব'লে সেই অনন্ত তুষারে
যেখানে শোনা যায় না কোনো বিহঙ্গকূজন
জলের কাকলি বা বায়ুর নিঃস্বন,
শুধু
আকাশের নির্মল নীল
প্রভাতের গলিত কাঞ্চন
দিনের দুর্নিরীক্ষ দীপ্তি
সন্ধ্যার অবর্ণনীয় বর্ণিমা আর
রাত্রির তারালোক
অগণ্য যুগ যুগ ব্যেপে নীরবে প্রতিবিম্বিত।
লোহা-বাঁধানো পাহাড়ি লাঠি ঠুকে
লোটা কম্বল পিঠে ফেলে
সেই পথেই চলেছি আজ
মানসসরের সন্ধানে।

ঝর্‌ঝর্ কল্‌কল্ শব্দে
উচ্চহাস্যে তড়িৎগতিতে
স্বর্লোকের চঞ্চল নৃত্যে
আনন্দতরঙ্গা অলকানন্দা নামছেন মর্তে ;
তারই ঘাটে ঘাটে

এ কূলে ও কূলে
কোথাও মঠ কোথাও মন্দির,
কোথাও বিহঙ্গসংগীতি, কোথাও ঝিল্লির ঐকতান,
কোথাও তীর্থযাত্রীদের সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি।
নূতন নূতন শোভার চমক প্রতি পদে।
শীতল ভোরের হাওয়ায় অজানিত ফুলগন্ধে বিমুগ্ধ করে ;
দিনের প্রথম আলোতে
মণিমুক্তা বর্ষণ করে অপরিচিত ঝর্ণা ;
পর্বতের শ্রেণীর পিছনে শ্রেণী
চূড়ার উপরে চূড়া
আকাশ-পৃথিবীর দূর হতে দূরে
অস্ফুট মেঘলেখায় মিলিয়ে গেছে শেষে ;
সমতলবর্তী জনপদ দেখা যায়
শিশুর খেলাঘর-হেন ক্ষুদ্র,
সিন্ধু শতদ্রু সূত্রাকারে বিসর্পিত,
পড়ন্ত বেলায় দীর্ঘ আলো দীর্ঘতর ছায়া
বনে পর্বতে এলিয়ে পড়ে,
সূর্য সহসা ডুবে যায় শিবালিকের পিছনে,
দিনের রঙ্গমঞ্চে তখনই নামে অন্ধকার যবনিকা ;
পথপার্শ্বে জনহীন চটিতে
রাত্রিযাপন করি ধুনী জ্বালিয়ে নিয়ে।

ভবঘুরে পথিক আমি
গেছি সুবর্ণবাহু শোননদ যেখানে
বিস্তীর্ণ বালুশয্যার প্রান্তে চলেছে কুটিলগতি,
অজগরপৃষ্ঠের মতো অসিত অবয়বে তার
ঝিকিয়ে ওঠে আলো ;
ত্রিশরণ-স্তবগানে বয়ে চলেছে নৈরঞ্জনা
নীল পাহাড়গুলির পাদদেশে
চিত্রার্পিত আম্রকাননের কোলে কোলে

পবিত্র বোধিবৃক্ষ-মূলে প্রীতিপূর্ণ অঞ্জলি সেচন করবে ব'লে ;
অর্ধচন্দ্রাকার গঙ্গার কূলে
হর্ম্যময়ী বারাণসীর মন্দির মিনার মঠ মসজিদ গৃহ
স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে
মহাকাশতলে মহেশের পূজানৈবেদ্যের মতো শোভমান ;
নীল যমুনার ধারে ধারে পিলুবনে
মিষ্টকষায় বুনোফল খোঁজে গোপবালিকা,
কদম্ববনে বাজে রাখালিয়া বাঁশি,
প্রভাতসন্ধ্যার আরতির রব মেশে জলকলস্বরে,
আর, নিশীথনৌবতের আলাপের অন্তরালে
চকিতচারিণী অভিসারিণীর নূপুররব শুনি বিজন হৃদয়ে
স্মরণাতীত অতীত থেকে।

গিয়েছি, যেখানে
দিল্লি-আগ্রার বহুযোজনব্যাপী শ্মশানে
ধূলিলুণ্ঠিত আজ পাঠান-মোগলের ম্লান মহিমা—
রয়েছে মিনার, নেই সেই রাজকুলবধূ
শিখর হতে দেখত যে প্রদোষকালীন কালিন্দীশোভা ;
রয়েছে তাজ, নেই সেই সম্রাট্‌প্রেয়সী
যার চরণোদ্দেশে বিরহী সঁপেছিল দুর্লভ উপঢৌকন ;
আজ আবার নূতন সাম্রাজ্যের নবতন দম্ভ
ইষ্টক-প্রস্তরে গেঁথে তুলতে চায় আপন শাশ্বত প্রতীক।
আবাল্য জেনেছি যাকে
ভাগীরথীকূলে বিদেশী বণিকের সেই রূপসী রাজধানী
ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করেছে যদিবা
প্রাণকে করে নি আকর্ষণ।

গেছি সেই সর্বজাতির শ্রীক্ষেত্রে
নীলে নীলে মিলেছে যেখানে আকাশ সাগর,
প্রধাবিত তরঙ্গ উৎসর্গ করে চলেছে ফেনপুষ্পের মালিকা

এক দিগন্ত থেকে আরএক দিগন্ত অবধি,
জেলেরা ভেলা ভাসায়,
শিশুরা কুড়োয় ঝিনুক শঙ্খ।

সিন্ধুসমুখ সূর্যরথ, জ্যোতির্ময়,
ভক্তের আরাধনায় পাষাণে নিয়েছিল সংহত রূপ—
লুপ্ত আজ বিগ্রহ, বিস্মৃত সব পূজাপদ্ধতি,
ঝাউবনে উঠছে অশরীরীর হাহারব,
পেচক বাসা বেঁধেছে জগমোহনে,
চমক লাগে তবু চেয়ে চেয়ে ভগ্নমন্দিরের পানে—
অচলে জাগল বুঝি সচলতা শ্রেণীবদ্ধ চক্রের অশ্রুত আর্তনাদে।

গিয়েছি
বালুপ্রান্তরে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে
মনে হয় ঐ বুঝি দেখা গেল সেই তটিনীরে
চিত্রোৎপলা নামটি রেখে শুধু
সব উৎপল সব ধারা নিয়ে যে
সমুদ্রে মিশেছে বহুদিন হ'ল।···
দুটি কূল ভ'রে নীরবে ব'য়ে চলেছে
বৈতরণীর প্রশান্ত কালো জল;
আনন্দিপুরের ঘাটে তারকিত সন্ধ্যায় একা উঠে বসেছি খেয়ায়,
দূরে দূরে এক-একটি দীপের প্রতিফলিত জ্যোতি
কম্পিত হয়েছে তটান্তসলিলে।

ঘুঘু—ঘূ! ঘুঘু—ঘূ!
শূন্য আশ্রমের কোন্ জাম গাছে
কোন্ মহানিম-শাখায়
থেকে থেকে জাগে অনুচ্চ কাকুতি—
উদাস হয়ে ওঠে পথিক প্রাণ।

২১ আশ্বিন ১৩৪২

স্বপ্ন

তখন প্রদোষের শান্তি
পরিপূর্ণ গঙ্গার দুই কূলে পরিব্যাপ্ত।
ও পারে মসীকৃষ্ণ বনলেখার শিয়রে
রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে
হংসেশ্বরীমন্দিরের পিছনে হাসছে চতুর্থী চাঁদ,
এ পারে বনস্পতির শিকড়ে শিকড়ে
পুরোনো ঘাটের জীর্ণ পঞ্জর গ্রথিত—
খেয়ানৌকা তারই একটিতে বাঁধা।

জনমানবের সাড়া নেই!
তরঙ্গের শুধু গদ্‌গদধ্বনি,
সূক্ষ্ম ঝিল্লিস্বর,
জোনাকির চমক আলোয় অন্ধকারে, আর
মালতীর বাসরসজ্জা কোন্ নিভৃত কাননে।

পদশব্দ শুনি নি,
চোখ ফিরিয়ে দেখলাম—
ঘাটের ও ধার থেকে ধীরে ধীরে
কে উঠে এল!
অলক্ষ্যে কখন পূজা ভাসালো তার
পূজারিণী!
পথের জ্যোৎস্নান্ধকারে মুহূর্তে বিলীন হল—
কোন্ গৃহে গেল বাস্তব স্বপ্নের মতো
আমার সমুখ দিয়ে!

বোলপুর
৩ কার্তিক ১৩৪২

আবির্ভাব

আকাশ-ধরিত্রীর মুক্ত এই মন্দিরে
আনন্দের অনিন্দ্যপ্রতিমা-রূপে
যেথায় তুমি বিরাজিতা হে সুন্দরী
আমার আগমন রিক্তা তিথির রিক্ত মুহূর্তে
মৌনমন্ত্র, পূজাবিহীন—
তোমার মুখ-পানে শুধু চেয়ে চেয়ে
মুখে হাসি আসে আর চোখে জল।

হে সুন্দরী, হে সুন্দরের দূতী,
এমনি ক'রেই চিরজীবন
কী জানি এসেছিলে কিনা
বাল্যকৈশোরের দিবসে নিশায়,
পুষ্পকাননে পিককূজিত প্রভাতে,
শৈলশিখরে তারাবিচিত্র প্রদোষে,
শহরে তূর্ণজনস্রোতের তরঙ্গশীর্ষে
দুপুর বেলায়
সামান্য ধূপছায়াআঁচলে অসামান্য মায়ামরীচিকা মেলে
মরীচিকারূপেই এসেছ বারম্বার,
অবুঝ প্রাণের নিয়েছ উপহার
একটি হাসি আর একটি দীর্ঘশ্বাস,
হয়তো কিরণদীপ্ত তোমার
এক ফোঁটা অশ্রুও।

সৌন্দর্যে কেন এ বিষাদ
আনন্দে কেন এ বেদনা
এবার বলো তুমি।

২৩ মাঘ ১৩৪৩

ব্রতী

এক-একদিন স্বপ্ন দেখি
দেশে দেশে ফিরছি দীন ভিক্ষুকের বেশে।
পরনে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া,
মাথায় জটা, গায়ে ধূলো—
মুখে পরম পরিতৃপ্তির হাসি।
ঘা দিয়ে বলছি দুয়ারে দুয়ারে,
'দাও গো ভিক্ষে দাও।'
বিদ্রূপ করছে, বিমুখ করছে কেউ ;
ভুল ক'রে ভাবছে হয়তো, 'আহা, কত দুঃখ ওর !'
আপন মনে পাই আমি, কী জানি, কার দুর্লভ প্রসাদ—
মুখে পরম পরিতৃপ্তির হাসি।

কিন্তু, এ তো মাঝ-রাতের স্বপ্ন,
রূঢ় দিনের সত্য নয়।
দিনের পর দিন দেখি আমাদেরও দোরে
আসে অভুক্ত, আতুর, খঞ্জ।
আসে অন্ধ বালক—
আমি তো হাত ধ'রে তাকে ঘরে টেনে আনি নে।
আসে গলিতকুষ্ঠ অভাগা—
ক্ষত ধুয়ে দিই নে তার তপ্ত অশ্রুজলে।
থাকি বাপের আদরে, মায়ের স্নেহে,
দু বেলা মুখে তুলি রুচিকর অন্ন ব্যঞ্জন—
দরোজা বন্ধ করে দিই
দরিদ্র আতুর বিশাল সংসারের মুখের উপর।
হায় রাতের স্বপ্ন !
হায় বাস্তব সত্য রূঢ় দিনের !

জাগো, জাগো প্রাণ !

দূর করো জাগরণের-মুখোষ-পরা স্বপ্ন, মোহ,
স্নেহের বন্ধন, সুখের ঘোর।
স্মরণ করো মৃত্যুশায়ী অগ্রজের পদধূলিতে
কী দীপ্ত তিলক প'রেছিলে ললাটে,
অসম্পূর্ণ কোন্ ব্রতের
দায় নিয়েছ মাথায় তুলে।

নীরবে গোপনে নিয়েছি ব্রত।
নইলে, প্রভাতভুবনের আলোমুগ্ধমতি
অন্যমনে আমি তো চলে যেতেম
গোধূলিআলোর বর্ণাঢ্য স্বপ্ন-পানে।
তেমন তো চলেছে বহুজন।
চলেছে, কিন্তু
অচিরে গুঁড়ো হয়ে যায় বাস্তবের
প্রস্তর-বাধায় ঠেকে।
তখন
কেউ করে হাহাকার,
কেউ করে অশ্রুপাত,
ভগ্ন চূর্ণ স্বপ্নের কীর্ণ খণ্ড যত
খুঁটে খুঁটে
বারে বারে জোড়া দিতে চায় কেউ নিষ্ফল মোহে।
আর, স্বপ্নসিদ্ধ যারা চঞ্চলের মতো
ছুঁয়েও ছোঁয় না পদতলে
রুক্ষ কঠিন রণবন্ধুর ভূমি—
তাদের কথা বুঝি নে আমি আজ।
বুঝি নে বারংবার কী লেখা লেখে
অলৌকিকের দ্যুতিইঙ্গিত
দিনরাত্রির সীমায় সীমায় তাদের
শুকতারা আর সন্ধ্যাতারা -রূপে।......
না, বুঝব না আমি।

মুগ্ধ ছিলেম, গর্বিত ছিলেম,
ছিলেম অন্ধ।
যতদিন ছিলে, ভাই, আমার পাশে
বুঝি নি তোমার সেবাব্রতী মাতৃপ্রাণে
প্রেমের বীর্য— সহজ, গভীর।
আসলে, ভালোবাসি নি তোমায়—
নিয়েছি দু হাত ভরে, দিই নি কিছু।
তারই শোধ দিলে কি অকালে স'রে গিয়ে ?
বিনা বাক্যে বিনা বিচারে
তোমারই দুরূহ ব্রত দিলে ?
দিলে আমায় ?……
স্নেহে কাঁদে, প্রেমে কাঁদে,
শোভায় কাঁদে মানুষের প্রাণ—
দুঃখে কাঁদুক ভীরু কাপুরুষ যে।

শহরে হা-ঘরে ভিখারিদের
শীতের রাত কাটাতে দেখেছি
ময়রার উনোনের ভস্মস্তূপে কুণ্ডলিত হয়ে।
আলোকপুঞ্জিত বিয়েবাড়ির বাইরে দেখেছি
উচ্ছিষ্টের আবর্জনাস্তূপ থেকে
মানুষে কুকুরে কাড়াকাড়ি।
দেখেছি প্রবলের হাতে দুর্বলের নিপীড়ন,
স্নেহহীনের ম্লান মুখ,
অন্নহীনের হাহাকার।
মনে পড়ে শাশ্বত ব্যথার জ্বলন্ত সে উক্তি :
মানবপুত্র মাথা গোঁজেন, ঠাঁই নেই এমন ঠাঁই নেই
মানবের সংসারে।
তাঁর স্থান বধ্যভূমিতে
ক্রুশে বিদ্ধ যেখানে নির্যাতিত ভাই,
নিপীড়িত বন্ধু।

তাদেরই মাঝখানে। তাদেরই মতো
আহত, মূর্ছিত, আর কাঁটার-মুকুট-পরা।

অগ্নি চাই। অশ্রু নয়,
প্রবঞ্চক করুণা নয়।
সংগ্রাম-ভরা এ সংসারে
দুঃখের সুখের সৌন্দর্যের অলীক কান্না কাঁদবে কে ?
সময় নেই। আত্মাহুতি দিতে হবে
প্রেমের বীর্যে।

'কী ভাবছি বসে' ?
না ভাই চঞ্চল,—
ঝাঁপ দিয়ে দেখো দেখি সুধাস্মিত তারকে
কী অসহ্য জ্বালা !
কী অনির্বাণ আগুন !

বোলপুর
৬ কার্তিক ১৩৪৪

বরযাত্রী

চলন্ত ট্রাম থামল কেন হঠাৎ ?
নাম করে না নড়বার।
নেমে পড়লাম।
কী একটা দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে, তাই
ট্রামের পিছনে ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে
রসারোডের মাঝখানে,
বেলা যখন দুটো।
রঙ-বেরঙের বাড়ি তিন-তলা, চার-তলা।
রঙ-বেরঙের দোকানে
পোশাক-পরিচ্ছদ, মনোহারী,

মোটরের তেল, ওষুধ,
ভাড়া দেওয়ার আসর-সরঞ্জাম। আর,
রাস্তার দু ধারে সমস্ত শহরটা
আদ্যোপান্ত উল্কি-পরা বিজ্ঞাপনে
প্রাক্‌প্রগতিশীল যুগের মেয়ের মতো।
চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গেল লোক,
আবার চলতে লাগল
চায়ের দোকানে বেকার ছোক্‌রাগুলি ছাড়া।
আর, ঐ লোনাধরা হলদে বাড়িটার
তিন-তলার বারান্দাটুকুতে বেরিয়ে এল
হাতের তাস হাতে নিয়েই হয়তো
কয়েকটি অন্তঃপুরিকা—
বিস্মিত হল : ব্যাপার কী!
চাপা পড়ল কেউ, না মোড়ের মাথায় শুধু
ট্রামের ঝুঁটি বাঁধা যে বৈদ্যুতিক তারে
ছুটে গেল হঠাৎ!
কে জানে!
অদূরে আমার গন্তব্য ঠিকানা। নেমে পড়লাম তাই।
ফুট্‌পাথে পা দিতে না দিতেই
হলেম নির্বাক্‌, বিস্মিত।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বলতেন
তমসার তীরে ঋষিকবির প্রথমনিশ্বসিত সেই ছন্দ
করুণায় যার উদ্ভব,
দুটি চোখ ভ'রে দেখবার মতো
রূপ নিল আজ শহরের পথে পথে।
হয়তো তাই, হয়তো নয়—
কেবল
এক-সার দেবদারু গাছ
আজ এই প্রথম ফাল্গুনে

(কে বা মনে রেখেছে
বিদেশী মার্চ্ নয়, স্বদেশী ফাল্গুন)
দেবদারু গাছ
ভরে উঠেছে নতুন কচি পাতায়
বৎসরান্তে আরএকবার।
না, না,
বাল্মীকিরই শ্লোক ওরা নব নব,
মূর্ত ওরা রাগ-রাগিণী,
অদৃশ্য স্বর্লোকমন্দাকিনীর
সুদৃশ্যশীকর'রাজি ওরা
দিকে দিকে ছিটিয়ে দিল আজ নন্দনের
বেহিসাবি বাউল বাতাসে।
নিশ্চিত জানি নে যে ওরা নয়
ছদ্মতনু অপ্সর কিন্নর
ধরার ধূলায় এসেছে কৌতুকে,
অপরিমিত কৌতুকে—
বঞ্চিত সুরসভা
যদিবা দেয় মৃত্যুঅভিশাপ,
কী কৌতুক তবু
কী অপরিমেয় কৌতুক
এই আলোয় এই বাতাসে
লোক-চলাচল-মুখর পৃথিবীর এই পথের দু ধারে!

পুলকশিহরিত,
কচি-সবুজ,
স্বচ্ছ,
উদ্ভাসিত অন্তরে আর বাহিরে
ওই পাতা—
ওই গাছ—
ওই দেবদারু গাছ সার-বাঁধা দেখি আর ভাবি

বসন্তের বরযাত্রায়
প্রথম দল বুঝি এরা
উৎসবপূর্ণপ্রাণ,
উৎসবপূর্ণতনু
চলেছে এরাই
স্থির এই দেবদারুগুলি। আর,
অতিব্যস্ত
মুখর
ক্লিষ্ট
এই-যে জনতা
চলার ভান শুধু এদের
কামনায় কল্পনায়—
মিছে, একান্ত মিছে

বালিগঞ্জ
৬ চৈত্র ১৩৪৪

বন্ধু

এখন বিকাল-বেলা।
পদব্রজে আর যান-বাহনে
গৃহপ্রতিবর্তীর দল আসে আপিস-আদালত থেকে।
হাঁক দিয়ে যায় 'কুল্‌পি বরফ',
কখনও 'বর্তনওআলা'।
সারি সারি রৌদ্র আর ছায়া
পথে এসে পড়েছে দীর্ঘ হয়ে।
আমার প্রতিবেশিনী
গ্রামোফোনে বাজনার রেকর্ড্ দিয়েছে—
সিন্ধু-কাফি হবে অথবা পিলু-বারোঁয়া
নির্‌ভুল বলব কি,
আমি যে অনধিকারী।

চাই,
নিতান্তই অলস-মনে চাই
দক্ষিণে বিদ্যাপীঠের পিছনে
ঐ যেখানে আকাশখানা
উদার, রিক্ত, নীল।

আহা,
ঝড় বয়েছে,
দক্ষিণ-হাওয়ার ঝড় বয়েছে
নারিকেল-সুপারির শিরে শিরে
এই বিকাল-বেলায়।
সঞ্চলিত ঐ পল্লবে পল্লবে
শুনতে পাই নে জেগেছে কী মধুর প্রলাপ!
ধূপছায়াচঞ্চল নটনইশারায়
যা বলতে চায় চোখ ভরে শুনি, আর
বক্ষে সঞ্চিত হয় দীর্ঘশ্বাস।

এ দিকে বাজে ভৈরবী,
বাজে বারোঁয়া,
বাজে কাফি
(বাজছে—
কোনো-না-কোনো সুরে বাজছে তো)
ও দিকে আলোয় আর বাতাসে
প্রহরের পর প্রহর ধ'রে
ধূপছায়াঙ্কিত হিল্লোলে হিল্লোলে
নারিকেল-সুপারির পল্লবে পল্লবে
কী যে চঞ্চলতা,
ক্ষণে ক্ষণে অধীর চঞ্চলতা!
সুর থেমে গেল যখন কানে
তখনও দু চোখে

তখনো প্রাণে
একি চঞ্চলতা,
ক্ষণে ক্ষণে অধীর চঞ্চলতা!

ঝর্‌-ঝর্‌ কল্‌-কল্‌ ঝর্‌-ঝর্‌!
ভারত-মহাসমুদ্র-ঘেরা একটি সে দ্বীপ আছে সুদূর দক্ষিণে,
এলাচি-দারুচিনির-ফুল-ফোটা শোভন গিরিব্রজে
ঝর্ণা ঝরে অহর্নিশ
রজতসূত্রের সাতনরী হার যেন গিরিহৃদয়ে:
ঝর্‌-ঝর্‌ কল্‌-কল্‌ ঝর্‌-ঝর্‌।
নিম্নে উপত্যকায় চরছে গোধন,
কোন্‌ কুটীরে উঠছে ধূমলেখা,
রবিশস্যের শ্যাম আর সোনা
যোজনের পর যোজন ছেয়ে।
বহু-যুগের-পায়ে-পায়ে-আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে
পল্লীবালারা আসছে শীতল সলিলের নিভৃত তীর্থে
মানুষের দুঃখে সুখে কৌতুকে
ক্ষণমুখর ক'রে সেই স্থান—
আবার ফিরছে
অস্তারুণ দিনশেষের শেষ জল কলসে ভরে নিয়ে
পল্লী-পানে।
স্বচ্ছন্দ তাদের গতি,
সরল মতি,
কুন্দশুভ্র হাসি, আর
চম্পকগৌর বক্ষ
অনাবৃত।

ঝর্‌-ঝর্‌ কল্‌-কল্‌ ঝর্‌-ঝর্‌
ঝর্ণা ঝরে।*

সর্-সর্ মর্-মর্ সর্-সর্
সাড়া দেয় নারিকেল সুপারি।
সূর্য ডুবে যায়, গিরিশিখরে
চাঁদ উঠে আসে।
ঝর্ণা তার চলার আবেগে
বন উপবন অধীর সমীরণে
বিরাম বিশ্রাম জানে না, কেবলই
ঝর্-ঝর্ কল্-কল্ ঝর্-ঝর্ বয়ে যায়,
সর্-সর্ মর্-মর্ সর্-সর্ সাড়া দেয়
শুক্লযামিনীর বহুদূর প্রহর অবধি।

হয়তো ঘুম-হারা বন্ধু আমার
দেউড়িতে বসে থাকে
স্বপ্নবিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে,
হয়তো বেহালা বাজায়
আরও দূর সমুদ্রের পারবর্তী কোন্
বন্ধুকে স্মরণ ক'রে :
সুরে সুরে সঞ্চিত হয়
হৃদয়ে দূরের
দীর্ঘশ্বাস।

বালিগঞ্জ
৬ চৈত্র ১৩৪৪

ছুটির শান্তিনিকেতন

আমি ভালোবাসি ছুটির শান্তিনিকেতন।
পরিপূর্ণ নির্জনতায়
ঘটের মতো দেহ মন ওঠে ভ'রে।

পিক-পাপিয়ার কলকণ্ঠ দেখো জাগে
মেঘমেদুর নিস্তরঙ্গ আকাশে।
বসন্তবৌরি আর ঘুঘুর ডাকে
খাদের উদাস স্বরলহরী
দিগ্‌বলয়ের পর দিগ্‌বলয় করে বেষ্টন।
সাদা-কালোর চকিত বিভ্রমে
শালিখেরা যায় উড়ে
শ্যামল নীল আর ধূসরের ভূমিকাতে।
উড়ে যায় কাক।
উড়ে বেড়ায় ফিঙে।

শুষ্কতৃণ আঁকাবাঁকা পথে আর
গৈরিক রঙের আঙিনাতে
বাতাসে মুছে নিল শত শত পদচিহ্ন।
শাল-মহুলের-ছায়া-বিসর্পিত সকালে সন্ধ্যায়
হেঁটে চলে তখন সাঁওতাল পুরুষ।
সাঁওতাল রমণী
শুক্‌নো ডালপালা কুড়োয় ঘুরে ঘুরে—
তাল-তমালের কালো গুঁড়িতে
মিলে যায় ওদের দেহশ্রী;
পুরু আঁচলের চওড়া লাল পাড়ে
কৃষ্ণচূড়ার ফুলের সঙ্গে পাতায় মিতালি।
তন্বী কিশোরীর
শিখীকণ্ঠে ঝিক্‌ঝিক্ করে চিকন পুঁতির হার,
তার
চকিত হাসির হিল্লোল লাগে শুভ্র শঙ্খচাঁপায়।
ওরা নিজজন নির্জনতার—
অক্ষুণ্ণ নির্জনতায় ওদের আনাগোনা
নিঃশব্দ, ইঙ্গিতময়, চিত্রপটে
অলক্ষ্য তুলির টানের মতো।

নির্জন।
ছাত্র আর অধ্যাপক
আছে তবু এখানে সেখানে
আপন আপন ধ্যানে নিবিষ্ট, অথবা
অলস স্বপ্নে উন্মন।
টিন-দেওয়া টালি-দেওয়া ঘরগুলি
পর্ণাচ্ছাদিত যত কুটীর
দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা
সবই শূন্য নয়।

মনে হয় তবু শূন্য।
মনে হয়
শিরীষ সোনাঝুরি দেবদারুর জটলায়
এখানে সেখানে মাথা জাগিয়ে
আত্মসমাহিত ওরা নিস্তব্ধ—
খোপে খোপে পায়রার বকাবকি,
প্রাচীরে ছাদে কাঠবিড়ালির দুরন্ত অস্থিরতা,
কোণে কোণে সার-বাঁধা পিঁপড়ার অশেষ সঞ্চরণ,
রুদ্ধদ্বার কক্ষে
ধূলি-আর-ছায়াচ্ছন্ন তৈজসপত্র,
এ ছাড়া বোঝে না খোঁজে না যেন কিছুই—
উজ্জ্বল দিবালোকে আর অপ্রদীপ যামিনীতে
অপূর্ব, অদ্ভুত।

স্তবকবদ্ধ সবুজ ফলের ঝুরিতে
শোভা পায় তালবন।
আপক্ব খর্জুরের পীতাভা ঐ অন্য দিকে।
শাল মহুল বিল্বের কানন-অবয়ব
বিচিত্র নবীন পত্রচ্ছদে
আজ দীপ্ত।

বৈশাখের মেঘমায়াহীন দ্বিপ্রহরে
তাকানো যায় না কৃষ্ণচূড়াবীথিঅভিমুখে।
আগুনে-পোড়া খোয়াইডাঙা থেকে
আগুনের হল্‌কা আসে হাওয়ায়।
ধূলি আর শুষ্কপত্র মিলে
নৃত্যোন্মাদ দর্বেশের মতো
মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে ছুটে আসে ঈষৎ ত্রাস জাগিয়ে—
এক পদের একটি অঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে
ঘুরে-ঘুরে ঘুরে-ঘুরে সহসা মিলিয়ে যায় নীল শূন্যে
গোয়ালপাড়া যাবার পথের এ ধারে
সারি সারি জাম গাছে পল্লবের ঝালর
ঝল্‌মল্‌ ঝল্‌মল্‌ করে রোদে—
ব্যাকুল বিবাগী যেন কী আবেগে
যেতে চায় শাখাবন্ধ ছেড়ে।

ভালোবাসি ছুটির শান্তিনিকেতন।
সৃষ্টিছাড়া এক চায়ের দোকানে
নিরুদ্দেশ দোকানীকে হাঁক দিয়ে
সোনালি-সিঁদুর বিকাল বেলা ঢলে সন্ধ্যায়।
দু পেয়ালা কবোষ্ণ সুধা
হয়তো জোটে, হয়তো জোটে না—
সূর্য ডোবে,
বাসা-ফেরা বিহঙ্গকুলের কাকলিতে
উন্মুখর হয়ে ওঠে বকুলতলা,
সন্ধ্যাতারা ফোটে পশ্চিমদিগ্‌ভালে,
শিয়রে উড়ে চলে দু-একটা বাদুড়,
অবশেষে স্তব্ধ
আলাপ-আলোচনার
প্রসারিত পাখায় দুটি মানুষের মন
উড়ে চলে দিশাহীন কালের দূর দূর জগতে।

শুক্লচতুর্থীর জ্যোৎস্নালোকে
পথ চিনে নিয়ে আম-বাগানের অলিতে-গলিতে
ফিরে আসি যে যার ঘরে।
শৃগাল ডেকে ওঠে মাঠের ও পারে।
ঝিল্লির ধ্বনি ওঠে কোনোদিন গভীর রাত্রে।
নক্ষত্রখচিত আকাশ
সুপ্তির শিয়রে জেগে থাকে শান্তি বিছিয়ে।
প্রত্যেক দিন আর প্রত্যেক রাত ভালো লাগে।
ভালো লাগে ছুটির শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতন
২৩ বৈশাখ ১৩৪৫

রৌদ্রমাতাল

রোদ্দুরের মদে মাতাল মন
(শীতের এই মিঠে রোদ্দুর)
কাঁচা-সোনা-ছড়ানো শর্ষের ক্ষেতে
মৌমাছির সঙ্গে অকারণ
গুন্ গুন্ করে সমস্ত সকাল-বেলা।
ঝিকিমিকি বালুকার বিস্তীর্ণ সৈকতে
নাম-না-জানা স্রোতস্বতীর
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ধারা দেখায়
স্রস্ত হারাবলীর মতো!
হঠাৎ হাওয়া দেয় যখন
লহরের ক্ষেতে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা চারাগুলি
পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ে আর
আলোছায়াবিচিত্র লহরী বয়ে যায় সবুজের।
দূরে দূরে পাহাড়
পাণ্ডুর মূর্তিতে আঁকা আপাণ্ডু আকাশে—
শ্রেণীর পিছনে শ্রেণী।

কী অটল গম্ভীর!
কী নির্বিকার বোবা!
ওদেরই মতো যদি
রোদ্‌দুরে পিঠ দিয়ে আমারও দিন যায়,
সমস্ত দিন যায়,
বিংশ শতকের আত্মাভিমানী এই সভ্যতার
ক্ষতি তো হয় না কিছুই।
চলে যাক তার শেষ স্টিমার
দিগ্‌বিদারী বংশীস্বরে ঘোষণা জাগিয়ে
ঘূর্ণাবর্তসংকুল ভরাডুবির ঘাট-পানে,
আমার থাক্‌
আকাশধরিত্রীর সংগমে এই অবকাশময় নিভৃতে
নদী পাহাড় আর শর্ষে ফুলের সঙ্গে স্যাঙাত-পাতানো
রৌদ্রমদে মাতাল
অলস দিন।

ঝাঁঝা
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

অবর্ণনীয়

লহরের ক্ষেতে হাওয়া দিয়েছে আজ,
হাওয়া দিয়েছে মুখরিত ক'রে
আকুল অশ্বত্থের ডালপালা—
মাঠের সীমানায় রসাল-মহুলের
ধূলিধূসর পল্লবের ঘনঘটায়
আজ পড়েছে সাড়া।
অঘ্রাণ-শেষের পীত রৌদ্রে
পরিপ্লাবিত দশ দিক।

হঠাৎ এক ঝাঁক দুধে-ধোওয়া পায়রা
উড়তে লাগল বাষ্পলেখা-টানা আপাণ্ডুর আকাশে—

উড়তে লাগল বিদ্যুতের চমক হেনে হেনে
অদূর কাননের অলিতে-গলিতে,
অবশেষে নামল
বুড়ো নিমের আড়ালে উঁকি দেওয়া
খোলার ছাদে—
এখন দেখাচ্ছে
রক্তচন্দনের পাটাতনে যেন শ্বেতচন্দনের ছিটে।

দেখি আর আঁকি বাক্যের বর্ণরেখা-পাতে—
ভাবি, আমার সাধ্য কই
ডেকে দেখাব কোনো জনে
দ্বাররন্ধ্রচ্যুত একটি রবিরশ্মি,
একটি তৃণমঞ্জরী!

ঝাঁঝা
২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

জমা-খরচের খাতা

নিজেই নামকরণ করেছি নিজের মনে—
যশোদা মায়ী, সুজাতা বেন।
এদেশিনী গোয়ালার মেয়ে
দুধ জোগায় প্রবাসী বাবুদের প্রভাতে আর প্রদোষে।
এসেছি হাওয়া খেতে—
ঘি-দুধ মধু-মিষ্টান্নের বেলাতেও তা ব'লে
নিরুৎসুক উদাসীন নই—
এসেছি বেহারের এক আধা-শহর আধা-গণ্ডগ্রামে।

সকালে দেখি
ভারী কাঠের বোঝা মাথায় এসেছে সাঁওতাল মেয়েরা—
অক্লান্ত পরিশ্রমে বনে বনে ভেঙেছে কাঠ,

চড়াই উৎরাই পথ ভেঙেছে কত পাহাড়ে পাহাড়ে ;
চতুর দোকানদারের দ্বারে দ্বারে এখন ফেরে,
দরে বনে না,
ঘুরে মরে ছোটো বাজারের ঠাণ্ডা-কঠিন
শান-বাঁধানো গোলকধাঁধার অলিতে-গলিতে।
দক্ষিণায়নের সূর্যও ক্রমশ প্রখর হয়ে ওঠে মাঝ-আকাশে ;
ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর রমণী, শেষে
অর্ধেক দামে বেচে দিয়ে যায় সমস্ত পূর্বদিনের পরিশ্রমের সঞ্চয়
কাঠের হাত-বাক্স আর খেরোবাঁধা খাতার স্তূপের পিছনে গদিয়ান
হৃদয়হীন ব্যাবসাদারিকে বলেছে মন, ধিক্ !

রঙিন ফুলের ফসলে উড়ে উড়ে বেড়ানো
ফুর্‌ফুরে প্রজাপতির মতো মেয়েদের নিয়ে
সন্ধ্যায় উলাই নদীর ধারে যাই হাওয়া খেতে—
যে জন্যে আসা।
সোনালি রুপালি বালি আর বালি ;
এখানে সেখানে তারই আলিঙ্গনে লীনাঙ্গিনী নদীটি,
শীতসুপ্তা রূপসী নাগিনী,
পাহাড়ি নাগের সহোদরা—
উর্মিল, চিত্রতনু।
ও পারে আম আর কাঁটালের বাগান ;
প্রস্ফুটিত অড়রের ক্ষেত !
সযত্নরচিত স্তরে-স্তরে-বিন্যস্ত চন্দ্রমল্লিকার বিছনে
অষ্টপ্রহরের বন্দিনী যেন চাঁদেরই হাসি, ঝর্ণাধারায়, তুষারের উপর।
চঞ্চল হয়ে ওঠে মেয়েরা, ছুটে চলে
আশাতীত শোভার আবিষ্কার -আশায় লুব্ধ—
স্ফুরিত অঞ্চলে আলোয়ানে
মনে জাগায় প্রজাপতির চঞ্চল ডানা।

চেয়ে দেখি উঁচু পাড়ির উপর দাঁড়িয়ে— অনেক দূরে

কটি অবধি নিমগ্ন বাষ্পকুহেলিতে
ধূসর গৃধ্রকূট,
একি দিনাবসানের ছবি তারই পিছনে
রিক্তসম্বল দিগ্বধূ
অস্তসূর্যের প্রয়াণপথে ছড়ালো একমুঠি শুধু ফাগ।

ফেরত পথের দু ধারেই সতেজ গমের জমি,
শুভ্র-ফুল-ছিটোনো মূলোর ক্ষেত ;
আলুর চারার তৃষ্ণা মেটাতে
ভার-বাঁধা লাঠা নুইয়ে কুয়ো থেকে জল তোলে তখনও চাষী ;
সাজানো ফসলের মধ্যেই সাজানো বাড়ি—
লেপামোছা মাটির গড়ন, খোলার ছাদ।
গরিবের ঘরণী ঝরা পাতা স্তূপীকৃত ক'রে পথের এক পাশে
পোড়ায় আর জল ছিটোয় ;
শীতের দীর্ঘ রাত সঞ্চিত তারই গুমো আগুনে,
শুনতে পাই, রুদ্ধঘরে
পরিবার-সুদ্ধ লোকের খিল-ধরা হাড়ে সামান্য একটু তাত পৌঁছবে।
তাড়াতাড়ি পেরিয়ে এসে দগ্ধ তৃণ আর প্রচুর ধোঁওয়া
ছোটো এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলি : হায়, কী কষ্ট !

আমাদের এই বাসায় রোজ সকালে
কালো মাটির ভাঁড় মাথায় দুধ জোগায় যে গোয়ালিনী,
প্রতিদিন প্রদোষে কন্‌কনে কাঁসার লোটা হাতে
মলিন মোটা কাপড় গায়ে জড়িয়ে গুটি-গুটি আসে যে বুড়ি,
মহুয়াগন্ধি মিষ্টি কথা যাদের বারো আনাই বুঝি নে,
নাম দিয়েছি তাদেরই দুজনের—
সুজাতা বেন আর যশোদা মায়ী।
বিহারী নাম ছাই মনে কি থাকে !
তা ছাড়া, হয়তো দেখেছি স্মিত সরল মুখের
অধরে চিবুকে সেই দেবের প্রসাদ

বুদ্ধের পদাম্বুজে পুণ্য পায়সান্ন-নিবেদনের
তৃপ্তির যা আভাস,
দেখেছি অপরার বার্ধক্যরেখাবলিত নয়নে সেই উজ্জ্বলতা
কোনো না কোনো জন্মে যা অব্যয় অরূপকে কোলে ক'রে
লালন ক'রে থাকে স্তন্যধারানুসঙ্গিনী স্নেহধারায়।
যা হোক, তারা তো জানে না— কাজেই,
সকৌতুকে হাসে না
গদ্যছন্দবিরচিত অদ্ভুত অনাহূত এই কবিত্বে।
জল মেশাতে তারা জানে না ;
আট সেরের বেশি দুধ দিতে চায় না টাকায়।
আমিও ক্ষীণ অনুযোগে জানাই— দশ সের,
অন্তত ন সের টাকায় না পেলে আমার বড়ো লোকশান।

চলছিল এইভাবে।
একদা সুজাতা এসে শুনল, দুধ তার ভালো নয়।
বাজার-ফেরত এসে দেখি, বসে আছে উঠোনের মাঝখানে ;
রাগ ক'রে দেয় নি সে দিনের দুধ ;
দাম চায় ;
দেখালে একবার, বটের আটার মতো দুধ —
এ কেন মন্দ হবে !
হোক বা না হোক, চুকে গেল দেনা-পাওনা ; চলে গেল।
দাঁড়ালো তবু আবার দরোজার গোড়ায় ;
মৃদুস্বরে বলতেই হল আধখানা ফিরে, 'বাবু,
আজকের দুধটা নেবে না ?'
তখন দুপর।
স্নানাহার শেষ ক'রে বাসার লোকেরা
মন দিয়েছে তাস-খেলা, পান-চিবোনো, আর
আরামের দিবানিদ্রাটিতে।

যশোদামায়ীকেও বলা গেল রাত্রে,

ভোরবেলার দুধ—
(শিশুর প্রাণরক্ষে আর বয়স্কদের চা-পানের প্রয়োজনে
ভোরেও দিয়ে থাকে আধ সের)
বলে দিলেম, 'আর দিয়ো না।'
কেন যে দেবে না বুড়ি কি বোঝে ?
বোঝে না যে দশ সেরের দরে দুধ পাব সকালে,
সেও ভালো দুধ—
বেশি দামে সুজাতা কিম্বা যশোদার কাছে নিয়ে কী ফল ?
রাত্রে যশোদা বরং দিতে থাক্,
জোগাড় করা যায় নি অন্যত্র থেকে।
ভাঙাচোরা হিন্দুস্থানিতে বোঝানো যায় এত ?
আমি সে চেষ্টা করি নি।
আম গাছের মহুয়া গাছের অন্ধকারে
গুটি-গুটি যায় আর ফিরে ফিরে আসে ;
নিচু পাঁচিল ঘেঁষে
বার বার জিজ্ঞাসা ক'রে গেল যা বুড়ি
কানে এখনো বাজছে—
'বাবু, আঁধেরে দুধ নেবে না ?
বিহানে দুধ নেবে না ?
সকালে কেনে দুধ নেবে না ?'

জমা-খরচের খাতায়
নাম টোকা আছে— যশোদা মায়ী, সুজাতা বেন !
খেপে খেপে দিয়েছি তাদের দু টাকা, পাঁচ টাকা,
বারো আনা, সাত সিকে,
এমন কত।
হিসেব মিলছে ঠিকই ডাইনে আর বাঁয়ে,
কম বা বেশি দিই নি।
নতুন হিসেবের পত্তন হল নতুন পাতায়।

আমাদেরই বাড়িওয়ালার খাতক, অর্থাৎ তারই ছোটো ছেলে
এইমাত্র দুধ দিয়ে গেল যে,
কী-যেন-ম'হাতো,
নাম দেব না তার নন্দলালা।

ঝাঁঝা
৫ পৌষ ১৩৪৫

হ্যারিকেন লন্ঠন

'হ্যারিকেন' জ্বেলে বসে আছি।
ভর রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল রাত দুটোয়
আমার এই আরামপ্রদ শয়নঘরে
তথা সংসারের ছোট্ট ভাঁড়ার-ঘরে।
থালা, ঘটি, বাটি, পানের বাটা,
তরি-তরকারি, মশলা, কাত-করা বঁটি,
ভিজে-ন্যাকড়া-জড়ানো শাক,
নানা আকারের 'হাঁড়ি সরা ভাণ্ড',
এক কোণে শিল আর নোড়া—
চোখ তুলে চাইলেই দেখা যায় সব।
ওরা কি আমার দৃষ্টিঅনুকম্পার ভিখারি?
না আমিই ওদের কল্যাণে
খেয়ে-দেয়ে বেঁচে-বর্তে আছি,
সুতরাং ওদের অনুকম্পাতেই
দৃষ্টিশক্তিরও অধিকারী হয়ে
চতুর্দশ ভুবন নিয়ে দেখা-দেখা খেলা খেলছি
রাত-বিরেতে
কেরোসিনের এই লন্ঠনটা কেবল জ্বেলে
এই ঘরে
এই ভাঁড়ার-ঘরে!···
তবু চেয়ে দেখছি নে ওদের।

আশ্চর্য লাগে।
চারি দিকে অন্ধকার···
না, আজ বুঝি কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া হবে ?
বাইরে আম জাম মহুয়া গাছের তলায় তলায়
অজস্র ঝরে পড়ছে ঠাণ্ডা, কন্‌কনে ঠাণ্ডা,
জ্যোৎস্নারুপোর কুচি—
অখণ্ড থান তার ছড়ানো আছে
(ভার নেই, না, ভার নেই)
বিস্তৃত মাঠে,
রক্তধূসর ন্যাড়া পাহাড়ে,
উলাইএর এলায়িত সলিলে আর সৈকতে।
তা হোক, রাতের অন্ধকার-রহস্যটি
স্বপ্নগুণ্ঠিত হয়ে ওঠে মাত্র এই জ্যোৎস্নায়—
অপসৃত হয় না।

বড়ো আশ্চর্য লাগে।
সেই সীমাহীন রহস্যের এক টেরে
জেগে বসে আছি আমি, এক কবি
(অন্তত এ মুহূর্তে তেমনটাই লাগছে তো)
হ্যারিকেনের পলতে বাড়িয়ে দিয়ে
মুখ ফুটে কী একটা কথা বলতে।
কী যে কথা
আশৈশব বোবা বুকের এত আঁকুবাঁকু সত্বেও
আজও জানি কি ছাই !

আশ্চর্য লাগে।
এই মুহূর্তে আমার কাছে
ধ্রুব আর সপ্তর্ষি আর অস্তোন্মুখ
কালপুরুষও তেমন সত্য নয়,
আকাশে ঐ অনাদ্যন্তকালের সাক্ষীরাও তেমন সত্য নয়

হ্যারিকেন লন্ঠন

(অচিন্ত্য দাহ আর অতিরমণীয় দীপ্তি সত্ত্বেও তেমন তো সত্য নয়)
যেমন এই হ্যারিকেনের আলো
মাঝে মাঝে শিখা যার কাঁপছে,
একটি কবি আর ঘুমহারা একটি পতঙ্গকে যে
মুগ্ধ করেছে, লুব্ধ করেছে,
কিন্তু ভোরের আগেই
এখনও-অকলঙ্ক ওর কাচ-আবরণ
ক্রমশ কালো কলঙ্কে আচ্ছন্ন ক'রে
তৈলাভাবে নিবে যাবে—
নিবে যাবেই তো ?
অকৃতজ্ঞ কবি,
স্মরণ করবে কি তাকে
যখন মুগ্ধ মনে আবৃত্তি করবে
চাঁদের আর শুকতারার আর নদী-পাহাড়ের গান
বিচিত্র সুরে—
স্মরণ করবে কি অকৃতজ্ঞ কবি
এই কেরোসিনের আলো,
এই ভাঁড়ার-ঘর ?

ঝাঁঝা
২৩ পৌষ ১৩৪৫
রাত আড়াইটে

অনুভব

হিয়া দিয়ে যার অনুভব তারে
ভাষায় বুঝাব কবে?
বুঝাতে চাহি নে ভাষায়, বুঝিয়ো
হৃদয়ের অনুভবে।

কত যে কোমল প্রভাতের আলো,
কেমন নিবিড় রাতি,
কত যে স্নিগ্ধ হৃদয়দেউলে
পূজার প্রদীপ'ভাতি,
কত কী যে এই চেতনার 'পরে
চকিতের মতো নামি
কত যে জাগায় নবীন চেতনা
কেমনে বুঝাব আমি?

ভাষায় তোমারে বুঝাতে চাহি নে,
ভাষাই বুঝিবে তবে—
অনুভব মোর তুলে লও, প্রিয়,
হৃদয়ের অনুভবে।

বৈদ্যপুর
৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৩০

কস্তুরীমৃগ

নাভির গন্ধে অন্ধ মৃগ সে বনে বনান্তে ধায়
ব্যাকুল পাগল-পারা—
কোথা কস্তুরী, কিবা কস্তুরী, সেই ধন শুধু চায়
হায় সে আত্মহারা।
চমকি চমকি চায় যে কেবল, চকিত নয়নপাত—
কখনো নিমেষ কোথা!
চমকি চমকি ধায় যে কেবল দখিনা হাওয়ার সাথ,
চপলার চপলতা।
নাভির গন্ধে অন্ধ যে মৃগ, প্রিয়পরিজনহীন,
কারেও সে চাহে না রে—
পরিজনহীন পাগল খোঁজে সে বনে বনে নিশিদিন
কী দূর দুরাশে হা রে!

শাখায় শাখায় অঙ্গে অঙ্গে জড়ায়ে জড়ায়ে দিয়ে,
শ্যামপল্লবে ছেয়ে,
নীরব নিথর আঁধারে আলোয় রহস্য বিরচিয়ে
অরণ্য আছে চেয়ে।
কখনো পবন নিশ্বাসসম বুকে ওঠে ফুলে ফুলে,
বনে বনে মর্মর—
দোলে ঘনশাখা, দোলে তরুরাজি, বন ওঠে দুলে দুলে—
ভূকম্প থর্-থর্।
মেঘে নভ ছায়, বজ্র গরজে, ঝরো ঝরো ঝর্ঝরে
নামে বরিষার ধারা।
গন্ধে অন্ধ মৃগ নিশিদিন বনে বনে খোঁজ করে
ব্যাকুল পাগল-পারা।

শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ জাগিছে, শীর্ষ তুষারময়,
শ্রেণীর পিছনে শ্রেণী—

নীরবে জাগিছে চিরবিস্ময় গিরিরাজ হিমালয়
এলায়ে সলিলবেণী।
অঙ্কে অঙ্কে ঝরে নির্ঝর, পাষাণে পাষাণে বেজে
ঝরে সহস্র শঙ্খ।
সানু উপসানু তরুলতিকায় বনে উপবনে সেজে
জাগিছে ছবির মতো।
প্রভাতে উঠিছে বিহগকাকলি, চমরী চরিছে দূরে,
আলোকে অখিল সারা—
গন্ধে অন্ধ মৃগ অবিরত ফিরে কী যে ঢুঁরে ঢুঁরে
ব্যাকুল পাগল-পারা।

নাভির গন্ধে অন্ধ মৃগ সে দিগ্‌দিগন্তে ধায়
ব্যাকুল পাগল-পারা।
কোথা কস্তুরী, কিবা কস্তুরী, সেই ধন শুধু চায়
হায় রে আত্মহারা।
আপন নাভির গোপন গন্ধ জানে না অবোধ প্রাণী,
আপনারে নাহি জানে।
আপন নাভির গন্ধে ফুটিছে আপন চিত্তখানি
আপনারই সন্ধানে।
নাহি লয় তৃণ, নাহি লয় বারি, নাহি রয় এক ঠাঁই—
দিশাহারা, দল-ছাড়া,
গন্ধে অন্ধ মৃগ কী যে খোঁজে, বিরাম কখনো নাই,
ব্যাকুল পাগল-পারা।

শ্রান্ত মৃগ সে, একদিন শেষে ছুটিতে পারে না আর,
মাথা রাখে তরুমূলে।
তেমনি চাহনি নয়নে তাহার, নয়নে নয়নাসার
বিন্দু বিন্দু ঢুলে।······
সহসা পেয়েছে— পেয়েছে সে তার চিরকামনার ধন—
নাভিতে তাহার একি।

হসিতোজ্জ্বল দীঘল নয়ন, ভরিয়া যায় যে মন
অনিমেষে দেখি দেখি।
নাভির গন্ধ ঘিরে দেহমন, মুদে আসে আঁখিপাত
সুচির সুরভি ঘুমে।
মর্মরে বনে মলয়, ঝরিয়া শিশিররাশির সাথ
দুটি ফুল ভূমি চুমে।

চাঁপাতলা।-কলিকাতা
১ চৈত্র ১৩৩০

পাখি

উষার আভাস নারিকেল-বনে হাসির মতন জাগে।
নারিকেল-পাতা কেঁপে কেঁপে মরে, ক্রমে রবিকর লাগে।
সমুখে উদার গগনললাট, পদতলে ধরাতল—
আলোকে আলোকে সমুখে পিছনে সবই হল সমুজ্জল।

বাতায়নে মোর অতি এতটুকু কোন্ বা অজানা পাখি
অধীর পুলকে বারেক উঠিল কলকাকলিতে ডাকি।
অতি বিচিত্র চিত্রিত পাখা তখনই আকাশে মেলি
উড়ে চলে গেল সম্মুখে পাখি চপলাচমকে খেলি।

পাখি ওরে পাখি, ও অজানা পাখি, নাম তো না জানি তোর।
নীড় নাহি জানি, লক্ষ্য না জানি, পথের না জানি ওর।
পাখি ওরে পাখি, কোথায় চলেছ, কোথায় চলেছ বলো।
পারাবারপারে কোন্ মহাদেশে কোন্ মহাবনে চলো?
কোন্ মহাকাশে কোন্ মেঘলোকে অলকার অন্দরে—
চরণের ছোঁওয়া দেবে কি ক্ষণেক ইন্দ্রধনুর 'পরে?
পাখি ওরে পাখি, পরীর জগতে কোন্ ফুলবন-মাঝে
কনকের পাতে হীরকের ফুল লাখো লাখো যেথা রাজে—

কোথায় চলেছ আলোকের পানে আলোকের অন্তরে
অতি-অপরূপ অতি-সুগোপন অলোক লোকের তরে ?

পাখি ওরে পাখি, ক্লান্তিবিহীন তোমার যুগল পাখা।
পাখি ওরে পাখি, ভারহীন তব কায়াটি পালখে ঢাকা।
পাখি ওরে পাখি, এতটুকু দেহে প্রাণটুকু নাহি ধরে—
অবিরাম তাই কণ্ঠে তোমার কলকাকলিতে ঝরে।
পাখি ওরে পাখি, যেতে যেতে তুমি বিরাম না জানো কভু—
তরুপল্লব মাথা নেড়ে ডাকে, চরণে না ছোঁও তবু।
পাখি ওরে পাখি, ত্রিভুবনে তব বাধা কিছু নাই তবে—
আলোক যেমন পবন যেমন চিরঅবারিত ভবে।
পাখি ওরে পাখি, শুধু পাখা মেলো, চলিতে হয় না যুঝি—
অভিলাষবশে অভিলাষসম তুমি চলে যাও বুঝি।

একদা প্রভাতে আমারই দুয়ারে কোন্ সে অজানা পাখি
একবার শুধু কলকাকলিতে উঠেছিল ডাকি ডাকি।
তখনই আবার পাখা মেলে দিয়ে উড়ে গেছে সম্মুখে
চপলাচমক হানিয়া হাওয়ায়, হানিয়া আমার বুকে।
চলেছে চলেছে নিয়ত সমুখে, সাগর হয়েছে পার—
পার হয়ে গেছে কত দেশ কত প্রান্তর কান্তার।
পার হয়ে গেছে মেঘময় লোক, পরীলোক গেছে ছেড়ে।
আলোক বেয়ে সে চলেছে চলেছে অবিরাম চলেছে রে।
প্রভাত এসেছে, সন্ধ্যা এসেছে, দিবসরজনী কত—
দিন-রজনীর পারে চলে গেছে জানি দেবতার মতো।

চাঁপাতলা। কলিকাতা
৮ চৈত্র ১৩৩০

পরিচয়

আমি তারেই ভালোবাসি, সে যে আমার হৃদয়-রানী।
আমার গোপন প্রাণের প্রণয় গোপন প্রাণে আমিই জানি।
মুখানি তার মুখের কাছে দু হাত দিয়ে ধ'রে তুলে—
নয়ন-'পরে নয়ন পেতে নিমেষ ভুলে— নিখিল ভুলে—
কভু তারে এমন ভাবে দেখি নাই গো! নাই বা দেখি,
ভালোবাসি তারেই, আমার হৃদয়-রানী নয়কো সে কি?

আমি তারেই ভালোবাসি। নাম জানি না, নাহি জানি
রূপের আলোয় আলো করে সে যে কাহার কুটিরখানি।
মুখের ভাষায় হয় নি আলাপ, সুধাবিনিন্দিত স্বরে
আমার সনে কয় নি কথা— রয় নি কথা আঁখিথরে।
তবু যখন নূপুররবে রুনুঝুনু যায় সে দেখি
আমি যারে ভালোবাসি হিয়ার পথেই যায় না সে কি?

তারে আমি ভালোবাসি আমিই জানি প্রাণের প্রাণে,
আমার প্রেমের দেবতাও আমার পূজা নাহি জানে।
আমার পূজা বিনা ফুলে, বিনা মন্ত্রে উপচারে—
নিমেষ-হারা নয়ন মেলি আমার পূজা পথের ধারে।
দুটি চরণ-সরসিজ বারে বারেই হেরে আঁখি—
দুটি চরণ-পদ্ম দেখে কী দেখা আর রইল বাকি?

পূবের দিকে বাতায়নে মেলে আমার মুগ্ধ আঁখি
প্রথম জাগরণের ধ্বনি বীণায় যবে বাজিয়ে থাকি,
স্নিগ্ধসজল উজল ধরা, সোনার ডালায় সোনার আলো—
আমার প্রতি প্রভাতখানি লাগবে ভালো, লাগবে ভালো।
আমার ফুলবনের কুসুম তুলতে শুধু আসিবে সে,
আমার গলে ফুলমালা নাই যদি বা দিল হেসে।

দুয়ারেতে ধূলায় ব'সে পুরবীতে গাহিব গান,
বিষাদ-ভরা উদাস সুরে উদাস হয়ে উঠিবে প্রাণ।
আমার এ দুখ আমার ব্যথা সফল হবে, সফল হবে,
দিনশেষের কলস ভ'রে এই পথে সে ফিরবে যবে।
পথে পথেই উছলিবে করুণ বারি কলস হতে—
দাঁড়াবে সে কলসখানি কক্ষ হতে কক্ষে ল'তে।

আমি যারে ভালোবাসি এই পরিচয় তাহার সাথে—
এই তাহারই কীর্ণ কিরণ আমার দিনে, আমার রাতে।
আমার একক রবিশশী— তারে কেবল ভালোবেসে,
ভালোবাসার ধেয়ান ধ'রে শেষ হবে এ জীবন শেষে।
দুঃখে সুখে চিরজীবন একটি সুরে চলবে বেজে।
জীবনে এই সফলতা র'বে এ প্রেম জীবনে যে।

আমি যারে ভালোবাসি নবজীবন-লোকে এসে
সহসা সে যদি আমার চোখে পড়ে নবীন বেশে
চোখে চোখে চাইব তখন, হাত দুটি তার ল'ব হাতে—
'আমি তোমায় ভালোবাসি' বলব মৃদু হাসির সাথে।
আমার চিরহৃদয়-রানীর মধুর হাসি সুধাধরে—
'জানি আমায় ভালোবাস' বলবে সুধামধুর স্বরে।

বৈদ্যপুর
৫ বৈশাখ ১৩৩১

বিরহ

দূরে সুদূরেতে চাই—
যাহা আছে যাহা নাই
হৃদয়ে সৃজন করে
বিরহবেদনময় দুখ।

কোথা হতে আসে হায়,
সব কোথা চলে যায়—
দু-এক দিবস -তরে
বাকি রহে ক্ষীণ স্মৃতিটুক।
আগে নাই, নাই পরে—
তাই যাহা মিলিল রে
মনোভুলে মন তারই
আগে পাছে যায় যে চলিয়া।
দূরে আঁখি নাহি চলে—
বাহুপাশ বাঁধি গলে
প্রিয়েরে দেখিতে বাধে
আঁখিনীর নয়নে গলিয়া।

ভাদ্র ১৩৩১

গোলাপ

ভ্রষ্টদল হে গোলাপ, মূক পরিম্লান,
তোমা-পানে নির্নিমেষ মেলি দু নয়ান
অন্তরে আমার জাগে কী জানি কী ব্যথা,
কী ভাবনা! নিখিলের জীবনবারতা
তোমারই জীবনরূপে বুঝি সচকিতে
আপনারে প্রকাশিল!

হে ক্ষণদয়িতে,
হৃদয়ের রক্তবর্ণ বাসনার মতো
অনিন্দ্যসুন্দর তব দলগুলি যত
কেহ চুমিয়াছে ধূলি, কেহ আজি ম্লান,
কেহ শুষ্ক। অসহায় উন্মুক্ত পরান
বিবশ ব্যাকুল, মরিল রে পলে পলে
নিষ্ঠুর রবির তাপে ম্লান ধূলিতলে।

কেবল একটু তব গন্ধ সুমধুর
আপনারে বিস্তারিয়া অদৃশ্য বঁধুর
সন্ধান করিছে বুঝি আপনার মনে।
ধূপ তিলে তিলে দহি দুঃসহ দহনে
গন্ধটুকু মেলে দেয় যথা দিকে দিকে
অন্তিমসময়াবধি।

চাহি অনিমিখে
ম্লান পুষ্প, তোমা-পানে, করিব স্মরণ
তোমার জীবনকথা — জনম-মরণ,
দু দণ্ডের হাসি তব, দু দণ্ডের সুখ
আলোকেতে বিকশিয়া উৎসুক উন্মুখ
অহেতুক আশাভরে! বলো কেবা জানে
অহেতুক আনন্দের অহেতু সন্ধানে
বিকশে জীবন!

কাহার অঙ্গনে তুমি,
লাবণ্যে উজ্জ্বল করি কোন্ বনভূমি,
ফুটিয়া উঠিলে পুষ্প? তরু দিবানিশি
গহন মৃত্তিকাতলে মেলি দিশি দিশি
তৃষিত রসনাচয় মুগ্ধ পান করে
অনন্ত জীবনসুধা। মৃত্তিকার 'পরে
দিকে দিকে মেলি দেয় শাখা: পত্রপুটে
স্বর্লোকের আলোহাসি শ্যাম হয়ে উঠে।
ভূলোকনিবদ্ধ দ্যুলোকবিস্তৃতপাণি
তুমি সেই জীবনের সফলতা জানি,
সুচির মৌনের তার একখানি ভাষা।
সফল স্বপন তার সবটুকু আশা
বুঝি মূর্তিমতী। এক ঠাঁই এক হয়ে
জীবনপ্রেরণা শত ওই রূপ লয়ে

নবীন জীবন-হেন উঠিয়াছে ফুটে
ধীরে ধীরে !

ছিলে সুগোপন পত্রপুটে,
ছিলে ক্ষুদ্র দৃষ্টির আড়ালে। সে বয়সে
অন্তর ওঠে নি ভরি সুগন্ধে সুরসে,
বর্ণের পরশ লাগে নাই দলে। পরে
প্রতি দিন-রজনীতে অন্তরে অন্তরে
জাগিল সুবাস, দলে লাগিল রক্তিমা—
ধীরে ধীরে মুকুলের সংকুচিত সীমা
সলাজে সরায়ে, পরিপূর্ণ মহিমাতে
প্রস্ফুট গোলাপ হয়ে জাগিলে প্রভাতে
একদিন।

গন্ধে তব ভরিল ভুবন,
উঠিল উন্মনা হয়ে দক্ষিণপবন,
ওই মুখে মুখ রাখি চুম্বনেতে ঘিরে
হাসিল আলোক— মধুকর ফিরে ফিরে
করিল বন্দনা। আলোকে সঁপিলে তব
অপরূপ শোভা, পবনেরে অভিনব
মধুর সৌরভ, লুব্ধ মধুকর সবে
সঁপিলে পরাগ মর্ম হতে। দিলে ভবে
তোমার যা-কিছু আছে ; দিলে অবশেষে
এ জীবন নিঃশেষে ফুরায়ে। ম্লানবেশে
সর্বসমর্পণ হাসি এখনো যে জাগে
ওষ্ঠে ওষ্ঠে তব।...

হায়, স্বপ্নঅনুরাগে
বিরচি জীবন তব স্বপ্নমোহময়।
স্বপ্ন তবু নহে তাহা, কল্পনাও নয়

সদ্যোবিকশিত আজ কবিকল্পলোকে।
ফুটেছিলে এ ভুবনে দিনের আলোকে ;
ফুটেছিলে এই দৃষ্টি সার্থক করিয়া
এক ঠাঁই একখানি মূরতি ধরিয়া।
অচিরে কিছুই তবু রহিবে না ভবে
চিহ্নঅবশেষ তব, না রহিবে তবে
স্মৃতি একটুকু। নামটুকু জানি না যে,
নাহি জানি পরিচয় তব। বিশ্বমাঝে
কোনো জীবনের বুঝি কোনো নাম নাই,
নাহি পরিচয়। সে যে চঞ্চল সদাই,
গৃহ নাই। অনিবার অনির্দেশ চলা
সিন্ধুতটবালুকায়, যায় না যে বলা
কোনো চিহ্ন রহিল কোথাও। এই আছে
এই সে যে নাই।

এ তবু কবির কাছে
পরিপূর্ণ সত্য নহে কভু, নয় নয়।
ক্ষণতরে যে গোলাপ এ নয়নময়
উঠিয়াছে ফুটি, অনাদি কালের কোলে
ফুটিয়াছে সে যে। দেখিতে পাব না ব'লে
অনন্ত কালের অঙ্কে রহিবে না সে কি ?
নয়ন মেলিয়া স্ফুট পুষ্পটিরে দেখি।
নাহি জানি তারই লাগি জগতে জগতে
কত আয়োজন! কোন্ দূর কাল হতে
নিখিল দেবের নিখিল সাধন'ফলে
এতটুকু এই শোভা এই ধূলিতলে
হয়েছে সম্ভব! মনে লাগে স্রষ্টা কবি
ফুটাইতে এ ফুলের এই মুখচ্ছবি
সৃষ্টিতে দিয়েছে হাত। কবির হৃদয়ে
আনন্দে রহিল ফুল চিরন্তন হয়ে।

জন্মমৃত্যুব্যবধানে ক্ষণেকের লাগি
বিকশে জীবন। ক্ষণিক সৌন্দর্যে জাগি
অবশেষে ছিন্ন ম্লান নিঃস্ব ধূলিস্তূপে
হয় কি লুণ্ঠিত?, অভিনব দিব্যরূপে
স্থন্দর সম্পূর্ণ স্ফুট তবু তো বিরাজে
সে জীবন অনন্তের হৃদয়ের মাঝে।

চাঁপাতলা। কলিকাতা
২০ পৌষ ১৩৩১

অশ্রুঅভিষেক

মুখের আলাপ ছিল যে দিন মুখে কেবল ফুটত হাসি।
ভালোবেসে তোমায় আজি নিতি নয়ন-জলে ভাসি।
কাঁদাতেও পারো এমন প্রথম হতে নাহি জানি।
আঁখিজলের অভিষেকে হৃদয়-রাজা এ প্রেমখানি।
সেই ভালো কি এই ভালো গো— সেই হাসি, এই আঁখিবারি—
কাঁদা-হাসার আসার-আলোয় কেমন যেন বুঝতে নারি।
সেই ভালো কি এই ভালো গো? এই ভালো, এই ভালোবাসি—
ভালোবেসে তোমায় আজি নাহয় নয়ন-জলে ভাসি।

১৪ ফাল্গুন ১৩৩১

রাত্রিযাপন

কণ্ঠে মোর নাই গান; চক্ষে নাই স্বপ্নঘোর।
স্পন্দিত হৃদয়ে শুধু জীবন রয়েছে মোর!
ফুরায়ে গিয়েছে ভাষা; ফুরায়ে গিয়েছে আশা!
হৃদয়েতে প্রাণ শুধু একাকী নিয়েছে বাসা;
শ্রাবণের সন্ধ্যাকালে দুর্যোগপীড়িত পাখি
যেমন কুলায়ে পশে, দুটি সকরুণ আঁখি

ব্যর্থ নিরীক্ষণে শুধু অন্ধকারে রয় চেয়ে।
ভুবনে অনন্ত অশ্রু ঝরে সারা রাত্রি ছেয়ে।

সারা রাত্রি জেগে জেগে ওরে পাখি, ওরে প্রাণ,
ভাবিছ্ কি প্রভাতের কলকণ্ঠশ্রুত গান?—
বিচিত্র নিখিলচিত্র স্নুন্দর অবনী-ভরা?—
ফলপুষ্পবিমণ্ডিত জীবনখচিত ধরা?—

ফল নয়, ফুল নয়, নহে প্রভাতের গান—
এ রাত্রি কি পোহাইবে জাগিয়া ভাবিছে প্রাণ।

বৈদ্যপুর
১৭ শ্রাবণ ১৩৩২

রাত্রি

সে ঘুম আসিবে কবে ঘুম হতে জাগিব না আর?
ক্লান্ত কাতর আমি ব'য়ে ব'য়ে জীবনের ভার।
অনন্ত অসীম জগতে কত আর ফিরি পথে পথে?
কোথায় আমার গৃহ? ··

গৃহহীন কোটি রবিতারা
অসীমেতে ভেসে যায় অসহায় আঁধারেতে হারা!
আঁধারের পাথারে দিবস মুদিল রে কমল বিবশ;
অসীম পাথারে সেই ডুবিল রে কমল একাকী
নীরব মন্দ্রে মাতে নিখিলে যে কূলে কূলে ঢাকি!

চমকে কি তারকার মালা? চূর্ণ ফেনার বুঝি জালা
আঁধার কূলেতে যবে আঁধারের ঢেউ এসে লাগে—
ভাষাকূল-হারা কোন্ কলোকলো কলরব জাগে।

বৈদ্যপুর
শ্রাবণ ১৩৩২

ডেকো না আমায়

বার বার এমন করিয়া
ফিরে ফিরে এসে
হৃদয়ের দুয়ার ধরিয়া
অতীতের মতো ভালোবেসে
ডেকো না, ডেকো না ওগো, আর
ডেকো না আমায়—
হাতে ধরি মিনতি তোমার!
আমি আর আমি নাই হায়!

শূন্য এ নিলয়ে ঘুরে ঘুরে
ফিরিতেছে কেঁদে
ও আহ্বান সকরুণ সুরে
অতীতের স্মৃতিময় খেদে!
ছিন্ন তব মুকুতার হার
নয়নের নীরে
হেলাভরে পথেতে আমার
ফেলিয়া যেয়ো না ফিরে ফিরে!
পারিব না প্রতিদান দিতে,
কিছু মোর নাই—
তাই আজ মিলাক অতীতে
অতীতের যাহা ছিল ভাই!

অতীতের মতো ওগো আর
ডেকো না আমায়!
ডেকো না, ডেকো না বার বার,
আর ভালোবেসো না আমায়!

বৈদ্যপুর
৩০ ভাদ্র ১৩৩২

মাধবী

প্রভাতে পথের ফুল যত্নে অবচয়ি
চুমেছি অধরপুটে মোহিত নিলাজ।
বলেছি, 'হে ক্ষুদ্র, শুভ্র মাধবিকা অয়ি,
তোমারে বাসিয়া ভালো ধন্য আমি আজ!'

অচেতন কক্ষতলে কঠিন পাষাণ—
মধ্যাহ্নে ফেলিয়া গেছি, ভুলিয়াছি স্মৃতি।
কে জানে নিভৃত চিত্তে সারাদিনমান
গন্ধরূপে জাগে কিনা মাধবীর প্রীতি।

সন্ধ্যায় বিশুষ্ক ম্লান মাধবিকাগুলি
প্রাণপণে নিশ্বসিছে নিঃশেষ সুরভি।
এ ভাষা শুনেছি আমি, শুনিয়াছে ধূলি,
'প্রণয়চুম্বন তব ভুলি নাই কবি।'

আঁধারে কুসুম-সম তারকার চোখে
অশ্রু ছলোছল্ মৃত কুসুমের শোকে।

বৈদ্যপুর
১১ আশ্বিন ১৩৩২

দিন যায়; কুসুমের পাপড়ির মতো
একে একে ঝ'রে যায় ম'রে যায়, হায়!
ছিল বর্ণ, ছিল গো সৌরভ,
ছিল শোভা, ছিল সব—
এখনো রয়েছে মধু কুসুমের হিয়ার হিয়ায়!
দিন যায়; কুসুমের পাপড়ির মতো
একে একে ঝ'রে যায়, ম'রে যায়, হায়!

অবশেষে জীবনের শূন্য বৃন্তখানি
নিরাশ বায়ুর শ্বাসে
ধূলায় লুটায়ে আসে
সকলই লুটেছে তার ধূলাতেই জানি'।

বৈদ্যপুর
১৬ মাঘ ১৩৩২

এ জীবন

শুধু স্বর আর কথা,
অবারণ হৃদয়ের ব্যথা···
হাসি অশ্রু মিলাইয়া ভালো
প্রভাতে বর্ষণধৌত আলো,
মধ্যাহ্নে মরুভূস্বপ্ন দূর মরীচিকা,
মেঘে মেঘে অস্তরাগ ক্ষণতরে লিখা,
গভীর রাতের বুকে
অনিশ্চিত স্থখে
তারার কম্পিত ভীরু দ্যুতি,
জন্ম-জন্মান্তের মুগ্ধ অন্ধ অনুভূতি,
ঊর্ধ্বে চেয়ে আজীবন স্মৃতি—
ভ্রষ্ট ফুল, লুপ্ত প্রেম, অসমাপ্ত গীতি···

শুধু স্বর আর কথা,
রূপে রূপে বর্ণচ্ছটাময়ী ব্যাকুলতা,
সঙ্গীহীন হৃদয়ের দুখ,
সর্বঅবশেষ চেয়ে দেখিবার স্থখ,
জীবনের রহস্যনিমগ্ন ভাব,
একান্তই আমার অতীত তোমার অরূপ আবির্ভাব,
এই শুধু এ ব্যর্থ জীবন
—জানো তুমি অন্তর্যামী ওহে ভগবন্!

১৭ মাঘ ১৩৩২

এ মোহ

মুক্ত করো, মুক্ত করো এ স্বপ্নজড়িমা !
জীবনের সীমা আছে, মোহের কি নাই কোনো সীমা?
ছুটে আসি অব্যক্তের অন্ধকার হতে ;
ডুবে যাই অলক্ষ্যের অন্ধকার-উদ্‌বেলিত স্রোতে।
কেন হাসি ? কেন কাঁদি ? কেন এত আলো
অগ্রে ও পশ্চাতে যদি অন্ধকারে ব্রহ্মাণ্ড ডুবালো ?
কে আছ ? কোথায় আছ আত্মীয়স্বজন ?
মুখে ভাষা, বুকে প্রেম, বিশ্বময় পূজাআয়োজন,
সকলই কি ব্যর্থ হবে ? অশ্রুজলে শেষ ?—
শোভা আছে, স্বপ্ন আছে, সত্যের কি নাই রে উদ্দেশ ?

বৃথা মোর শোক !
হাসিয়া জেগেছি প্রাতে ; প্রদোষে অশ্রুতে শেষ হোক !

বৈদ্যপুর
১৯ মাঘ ১৩৩২

প্রভাত

গান : গন্ধ আলো : হৃদয়

বৃষ্টিতে ধোওয়া এই আলোখানি
ধরণীরানীর পড়িল মুখে।
দূরে কলতানে ডাকে গো পাপিয়া
অধীর পরানে, আকুল সুখে।
পাপিয়ার স্বর দেখিতে দেখিতে
গ্রামে গ্রামে কভু ছাপিয়া উঠে,
এই আলোকের অন্তরে যেন
একটি স্বরের প্রবাহ লুটে।

উৎসের মুখে গলিত তুষারে
(চকিতে চকিতে গলিয়া চিত)
সুরের প্রবাহে ঢেউ ছুটে আসে,
চকিতে কোথায় অন্তর্হিত।
পাপিয়ার গানে প্রাণ গায় মোর
নীরবে নীরবে আপন-মনে—
যত দূর হেরে তত দূরে যায়,
গেয়ে চলে, গান আপনি শোনে।

আজি এ প্রভাতে স্নিগ্ধ উজল
সমীর রয়েছে ঘুমায়ে বনে,
মৃদুল বাতাসে সরসীর বারি
শিহরিয়া উঠে সংগোপনে।
কেশরে শিহরি ফুটিল কদম—
বিমল প্রকৃতিললাট-'পরে
কদম'কেশর বুলায় প্রভাত
প্রসাধনছলে, পরাগ ঝরে।
সুখস্বপনেতে সমীর মগ্ন—
জানি না কেমনে ছাপায়ে দেশ
নিরালা এ ঘরে নীরবে পশিল
কদমরেণুর গন্ধশেষ!
কুসুমরেণুর পরশে শিহরি
ফুটিল মরম'কুসুমখানি।
যত দূরে যায় মধুর সুবাস
আপনা হারায় ধন্য মানি।

অসীম আকাশ ছাপিয়া এ আলো
অসীম নিখিলে পড়িল ছেয়ে।
আকাশের নীলে মাজিল আলোক,
আলোকের হাসি-ধারায় নেয়ে

সমুজ্জ্বল বেশে দাঁড়ালো নিখিল—
হিরণে হরিতে অঙ্গ ঢাকে।
নিমেষ ভুলিয়া অবাক্ মানব
নয়ন মেলিয়া চাহিয়া থাকে।
আলোকের রূপ একি অপরূপ!
ধরিয়া বাঁধিতে পারি না কেন?
অনন্ত রূপ করিয়া প্রকাশ
অরূপ মিলালো হৃদয়ে যেন।
হৃদয় আমার! হৃদয় আমার!
অপরূপ আলো! অরূপ রূপে
অনন্ত রূপ করিয়া প্রকাশ
নিখিল ছাপিয়া যাও গো চুপে।

বৈদ্যপুর
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

চাওয়া

বেলা গেল চেয়ে তোমার আধ-ফিরানো মুখের পানে।
বারেক তুমি চাও না ফিরে, দূরে কোথা চাও কে জানে!
আলো ঝরে তোমায় ঘিরে,
পুষ্প ঝরে তোমার শিরে—
ফিরে ফিরে পাখিরা গায়! জলে আবার জোয়ার এল!
চেয়ে চেয়ে তোমার মুখে
বেদনাতে বিধুর সুখে
বাজে বুকে গানের মতো! কী জানি এ কেমন ভেল!
হাসে আকাশ, আলো হাসে
তরুলতায় শ্যামল ঘাসে,
গোপন হাসি তুমি হাসো নিখিল হাসি-সাথে-সাথে!
চিনি তোমায় চিনি না যে,
'হারাই'-ভয়ে মাঝে মাঝে
ডাকি আকুল পাখির মতো আলোমগন এই প্রভাতে।

বেলা গেল, বেলা গেল চেয়ে তোমার মুখের পানে।
বারেক তুমি চাও-না ফিরে! নয়ন রাখো মোর নয়ানে!

বৈদ্যপুর
২৫ ফাল্গুন ১৩৩২

মৌনআলাপ

তোমায় আমায় মৌনআলাপ সেই তো আলো, সেই তো হাসি
তোমায় আমায় চোখের চাওয়া এই তো বড়ো ভালোবাসি।
সে আলোকে, সেই হাসিতে, প্রভাতে আজ সেই আলাপে
মুকুলিত অরুণ পাতা প্রতি তরুলতায় কাঁপে।

নারিকেলের বনে বনে
বাতাস বেড়ায় আপন-মনে,
এখন কে কার কথা শোনে—
পুলক-ভাষণ জুড়ে পাখি,
পিক-পাপিয়া কলস্বরে একই সাথে ওঠে ডাকি।
দুধে-ধোওয়া কপোতগুলি
উড়ে বেড়ায় আলোয় বুলি,
ভাঙা পথের রাঙা ধূলি
পথচারীর চরণ-তলে
জেগে উঠে ফুলের সাথে তৃণের সাথে কী যে বলে!
আঙিনাতে প্রভাত-বেলা
নগ্নছবি শিশুর মেলা,
মায়ে পোয়ে কোথাও খেলা—
পরস্পরে দেয় গো চুমা,
সেথা বিরল বাতায়নে প্রভাতআলো পায় উপমা।

তুমি কোনোই কও না কথা, নিখিল ছবির অন্তরালে
আপনারে গোপন রাখি নীরবে রও কালেঁ কালে।

তোমায় আমায় মৌনআলাপ তাইতে আলো, তাইতে হাসি।
তোমায় আমায় চোখের চাওয়া ইহাই বড়ো ভালোবাসি।

বৈদ্যপুর
১৯ চৈত্র ১৩৩২

বিহঙ্গ

জলধি গাহিছে জলদমন্দ্রে, সে অতল ভাব কোথায় পাব ?
হৃদিফুলে মম মধুঅনুভব !··· বিহগের মতো প্রভাতে গাব !
চিত্রিতপাখা বিচিত্র পাখি
কভু গাহি আর কভু চেয়ে থাকি,
জানি না বুঝি না কারে আমি ডাকি আধোকাকলিতে আলোকে সারা !
কভু উড়ে যাই নীল নভ-পানে,
চিরদূর কত দূরে যে কে জানে—
নীলের পরশ বায়ু বহি আনে, নীড়ে ফিরে আসি আত্মহারা।
বর্ষাপ্রভাতে বনের ভবনে
উছসি উছসি পবনে পবনে
তরুপল্লব কাঁপে গো কেমনে, অঙ্গে উজল মুক্তামালা !
ভাঙা ঘাটে রয় শেফালিকা ঝরি,
জোয়ারের জল কূলে কূলে ভরি
একে একে লয় ফুলগুলি হরি— ছায়াবাটে আসে পল্লীবালা।
কভু সিক্তকদম-কুসুমের বাস
সুপ্ত পবনে ফেলে মৃদু শ্বাস—
তখন জাগিয়া উঠে গো বাতাস, বহিয়া শুভ্র নীরদে লাগে।
আজি বকুলের শাখে মদির গন্ধে
গেয়ে ওঠে মম প্রাণ আনন্দে—
আরও কার প্রাণে তাহারই ছন্দে প্রতিগান কোন্ বনেতে জাগে !
চির শরতের ভোরে আলোকধারায়
স্বর্গআভাস ভাসিয়া বেড়ায়—
ধরা সে পড়ে গো শুধু এ ধরায় প্রিয়ার নয়নতারার নীলে !

একি   সীমা নাই তার, নাহি পাই তল !
           পক্ষপরশে হৃদি বিহ্বল !
যুগল চঞ্চু মিলায়ে কেবল স্বর্গের সুধা এই কি মিলে !
মেঘে   কী অলকাপুরী গোধূলিলগনে
           বর্ণে বর্ণে নীরব গগনে
নব নব রূপে ফুটে নবখনে— অবোধ মুগ্ধ ধাই গো মোরা !
বায়ে   বকুলের বন নিশ্বসি উঠে,
           নিমেষে অলকা কোথা পড়ে লুটে—
সন্ধ্যার ভালে তারকাটি ফুটে নীরবে বহিয়া যায় যে হোরা।
হেথা   ধীরে নারিকেল-পল্লব সরে,
           পূর্ণিমাচাঁদ সেই অবসরে
মুখ টিপে হাসি বিকিরণ করে পূর্বগগন করিয়া আলা।
ও যে   ক্ষীরোদসাগর মথনের ধন—
           উলটি ধরিল উদার গগন
অক্ষয় সুধাপাত্র আপন, দশ দিক হল সুধায় ঢালা।
রাতে   প্রাণে আনন্দ লাগিয়া লাগিয়া
           বার বার উঠি জাগিয়া জাগিয়া—
নানা ফুলবাস মিশাইয়া গিয়া ঘ্রাণে উচ্ছ্বসে অভাবনীয়।
মরি   মরি রে ! কবির মুগ্ধ হৃদয়
           পাপিয়ার হেন ভুলি সমুদয়
স্বপ্নভুবনে আঁখি মেলি রয়, কারে ডাকে ‘প্রিয় প্রিয়-হে প্রিয়’ !

বৈদ্যপুর
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

আনন্দঋণ

নিখিলের শত পরশে পরশে আনন্দ জাগে চিতে।
অপরিসীম এ আনন্দঋণে
ঋণ বাড়ে মোর প্রতি রাতি-দিনে,
আমি গাহি গান প্রতিদিন তাই প্রতিদান তার দিতে।

আনন্দ দিলে, আনন্দ তাই ফিরে আমি করি দান।
ওগো, লও লও যা আছে আমারই।
তোমার যোগ্য কিবা দিতে পারি!
কোথায় নিখিলনিস্রুত গীত, কোথা এ তুচ্ছ গান!

বিদায়ের বেলা অনন্ত ঋণে ঋণী হয়ে যাব ভাসি।
মিলাবার আগে অনন্ত দূরে
তব আনন্দ লব বুক পূরে,
বলে যাব শেষ পুরাতন সুরে 'ভালোবাসি ভালোবাসি'।

জানি না হেথায় যে আছ সেথায় সেই তুমি আছ কিনা।
হেথাকার ঋণে সেথায় কি তব
বেঁধে লবে বাহুবন্ধনে নব?
অসীম আলোকে র'বে না কেহই তুমি আর আমি বিনা।

অক্ষয় তব প্রেমে সিঞ্চিত উদার বিশ্বভূমি—
সে যে গো অমৃত, অমরতা তবে
মর্তের কেন আপন না হবে?
লোকে লোকে প্রেমরসউৎসবে আমারে ডেকেছ তুমি।

হেথা বড়ো ভালো লেগেছে তোমায়। আরও কি বাসিব ভালো?
এত সুখ দিলে পলকে পলকে—
পলক যেথায় রহিবে না চোখে
কী পুলক দিবে! কী দিব তোমারে হে মম আলোর আলো!

১২ শ্রাবণ ১৩৩৩

অন্তরে

ওগো, কলগান গেয়ে বহে সুরধুনী নীল তরঙ্গ তুলে।
দেবদারুবনে মর্মর শুনি, উপবন ভরা ফুলে।
ওগো, কুয়াশামুক্ত আজ দিগন্তে গিরিরাজ
বিরাজে শুভ্র তুষারমুকুটে মৌন কী মহিমায়।
ওগো, নীল সুরধুনী কলগানে লুটে, তরঙ্গ উঠে তায়।

ওগো, আলোয়-আলোয়-ঝলোমলো নভে বিহগমিথুন বুলে।
উপবন ভরা মর্মররবে কিরণে শিশিরে ফুলে।
ওগো, পূজার পুণ্যডালা শুভ্র গোলাপ-মালা
" ঘাট হতে ঘাটে ভেসে অবশেষে হারাইয়া ফেলে কূল।
ওগো, গান গেয়ে যায় বাতায়নে এসে পথভোলা বুল্‌বুল্‌।

ওগো, উৎসববেশে হাসে নরনারী, সুখ দুখ করে ভিড়।
পথিকের গানে মুখর, আ মরি, ছোটো একখানি নীড়।
ওগো, এই হাসিমুখখানি, এই নয়নের বাণী—
না মিলিতে মোরে কোথায় মিলালো এই আশা এই সুখ !
কোন্ ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে চকিত কী আলো ছায়ায় ঢাকিল মুখ !

ওগো, চির-আনাগোনা তারই মাঝখানে কুটীর বেঁধেছি আমি !
আলো ফুল হাসি গন্ধ কি গানে ফিরে ঘিরে দিবাযামী।
ওগো, চেয়ে সকলের পানে ব'সে ফুল'মাঝখানে
নয়নে অশ্রু কেন অকারণ ! কিসের দীর্ঘশ্বাস !
তবু, কেমনে করি গো হৃদিনিবারণ ভরা সুখে করি বাস !

ওগো, সব ভালো যাহা আঁখি মেলে দেখি, আঁখিতারকার সুখ।
বাহিরে কী শোভাউৎসব ! একি পরিচয় উন্মুখ !
ওগো, হৃদয়ে কোথায় বয় সুরধুনী সুরময় ?
ফুলে ফুলে ভরা কোথা উপবন ? কোথা আরতির ডালা !
হায়, শূন্য আমার হৃদয়ভবন ! কোথা পূজারিণী বালা !

ওগো, হৃদিঅঙ্গনে নাহি উৎসব, সে পথে পথিক নাই !
তিমিরে আবৃত আকাশে নীরব তারকা কোথায় পাই !
সেথা গাহে না একটি পাখি পিয়া-পিয়া-পিয়া ডাকি,
কোনো শিশু সেথা ধূলায় খেলে না খেলা-ভোলা ভগবান !
ওগো, কেহ যে মেলে না, কিছু যে মেলে না, ধুধু করে শুধু প্রাণ !

২২ চৈত্র ১৩৩৩

আশা

ওগো, বহুদিন লাগে হৃদয়ের কোণে একখানি আশা গড়িতে,
স্বপনের মতো টুটে যে কেমনে চোখে না পলক পড়িতে।
তাহে কত প্রভাতের অরুণকিরণ, কত-না বিভাসরাগিণী,
কত প্রদোষের ছিল গো হিরণ— ছিল সে স্বপনভাগিনী।
হায়, সুখের স্মরণ প্রণয়ের প্রাণ দেবের আশিস -পবিতা
সে আশা যেন গো গায়কের গান, কবির যেন সে কবিতা।
ওগো, বহুদিন লাগে সেই আশাখানি হৃদয়ের কোণে গড়িতে,
মিলায় কখন মলিনমুখানি চোখে না পলক পড়িতে।

ওগো, দিনে দিনে শুধু প্রিয়পরিজনে বিরাগে যায় যে ফেলিয়া।
বিরহিণী জাগে হৃদয়বিজনে তিমিরে নয়ন মেলিয়া।
পরে পর আর কেহ আপন হয় না, ভয় বাসি ভালোবাসিতে।
দুখ সহে, সুখ আর তো সয় না— আঁখিজল রয় হাসিতে।
হায়, আপনার মনে মনের ভিতরে দিবসরজনী গাঁথিয়া
বিফল জীবন কেন কার তরে রাখিনু আসন পাতিয়া!

বৈদ্যপুর
২৮ চৈত্র ১৩৩৩

পরিণাম

অনূদিত

রৌদ্রদীপ্ত বেলায় একদা উন্মদ বৈশাখে
পীযূষগন্ধঅনুমান কোন্‌ গূঢ় কামনার ডাকে
নিরুদ্ধগতি উন্মনমতি চিত্রপতঙ্গম
ক্ষণতরে থেমে ফুল্ল ফুলের সুধাধরসঙ্গম
চেয়েছিল আর মধুটুকু তার পীয়েছিল নিঃশেষে।…

দীর্ণকুসুমদলবিকীর্ণ ভূমি—
ফিরে তো চায় না, বারেক কুসুমে চুমি
নীলাকাশ-পানে ধায় পতঙ্গ উজ্জ্বলনীল বেশে।

প্রেমের দেবতা নেমে কেন এল ধূলির ধরণী-'পরে—
নয়নে করুণ মিনতি, ভুবনমোহন মুরলী করে।
বলে ম্লান হাসি, 'আমি গো প্রবাসী, শ্রান্ত পথিক, তব
কমনীয়হৃদিহিন্দোলে সুখ'স্বপনে ঘুমায়ে রব—
সুরভিশ্বাসবীজনে প্রেয়সী, ক্লান্তি করিয়ো দূর।'…
শূন্য শয়নে নিশিঅবসানে জাগে—
আতুর নয়ন দরশন যার মাগে
রমণীর প্রাণ ভেঙে খান্-খান্ করেছে সে নিষ্ঠুর।

রাধাকুণ্ড। ১৩৫৬

বাসন্তী ইন্দ্রজাল

অনূদিত

গিরির গহন গুহায় মৃত্যু-শীতল শিলার তলে
সমাধি রচিয়া প্রাণের আমার কহিনু অশ্রুজলে,
'আশাহীন ওরে দীর্ণ হৃদয়, ঘুমায়ো অশেষকাল—
মায়াবী ফাগুন চৈত্র যে দিন নূতন ইন্দ্রজাল
বনে উপবনে বিথারিবে, পিক কুহরিবে কুহুতান,
জাগিয়ো না আর, বক্ষে নিয়ো না নিশিত বেদনাবাণ।'

বসন্ত এল : কিংশুকে আর অশোকে রক্তশিখা
ঝলোমলি উঠে, উষাসন্ধ্যায় সোনার-লিখন-লিখা
লঘু মেঘমালা, মুহুমুহু পিক'কুহরিত বনবাস—
সমাধিশয়নে চমকিয়া জাগি প্রাণ কহে, 'মধুমাস
ঐ এল বুঝি, এল, গায়ে কার লাগে যে সুরভি শ্বাস!'

রাধাকুণ্ড। ১৩৫৬

দুঃখআবাহন

এসো দুঃখ, এসো দুঃখ কঠিন কঠোর রুক্ষ—
পীড়িয়া ছিঁড়িয়া মোরে করো নির্যাতন।
হে বৈরাগী, ভালে তব এঁকে এসো অভিনব
উজ্জ্বল তিলক বহ্নিশিখার মতন।
লৌহের বলয়ে ঠেকে লৌহদণ্ড থেকে থেকে
জাগুক নিদ্রিত প্রাণে ঘোর বজ্ররবে।
তোমার চকিত দৃষ্টি করুক বিদ্যুদ্‌বৃষ্টি,
হাসো অট্ট অট্ট হাসি প্রলয়উৎসবে।
প্রলয়উৎসব-মাঝে কী আতঙ্কে কোন্ লাজে
করজোড়ে অনুগ্রহ করিব কামনা!
সুদুঃসহ নৃত্যভরে চিত্ত টলোমলো করে,
সে বিপুল অনুগ্রহে হৃদয়ে নামো-না।
হোক যদি তাই হয়, দীর্ণ হৃদি নিরাশ্রয়
সর্বস্ব হারায়ে হোক রসাতলগামী।
যাক মোহ সুখ হাসি, যাক গীত বীণা বাঁশি—
নিঃশেষিত সর্বনাশে তুমি আর আমি।
নিষ্ঠুর নির্মম তুমি, পবিত্র উদাস তুমি,
পাবকস্বরূপ তুমি রুদ্র গরীয়ান—
আমি তব অনুরক্ত ঋত্বিক্, গায়ক, ভক্ত,
তোমারই ইন্ধন আমি করি আত্মদান।

কেবল সুখের কোলে আজন্ম লালিত হলে
জীবনে জাগে না প্রাণ, প্রাণে মহাবল।
বিদীর্ণ প্রস্তর টুটে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ছুটে,
জড়েও চেতনা আনে সংঘাত কেবল।
হুতাশদহন বিনা স্বর্ণ যায় না চিনা,
হুতাশনসম কান্তি হয় না তাহার।

অসংখ্য আঘাতে দুখে নির্দয় ছেদনী-মুখে
কিরীট কুণ্ডল গড়ে, গড়ে হেমহার।
মন্দারলতায় ধরে ফুল্লশোভা থরে থরে,
রচিছে দুঃখের শিল্পী অশেষের শেষ—
কালের উন্নত শিরে কালের উরস্ ঘিরে
সাজায় মুকুটে হারে অনিন্দিত বেশ।
ব্যর্থসুখস্বপ্নাবেশে দুঃখ বিনাশিল এসে,
শিল্পীসম জীবনেরে করিল নির্মাণ,
প্রতি বেদনার বাণী জীবন সার্থক মানি
মৃত্যুরে মানিল পুন অমৃতসমান।
দুঃখের-প্রদীপ-জ্বালা জীবন হইল আলা,
দুঃখের সুরভিধূপে আমোদিত মন।
মরু সে সর্বস্বহারা, অন্তরঙ্গ ফল্গুধারা
উৎসমুখে উৎসারিয়া জুড়ালো জীবন।

এসো দুঃখ, ঘূর্ণাঘোরে ছিন্ন ক'রে লও মোরে
সুখ হতে, স্বস্তি হতে, গৃহকোণ হতে।
হোক-না নয়ন অন্ধ, কেবল ঘুচাও বন্ধ,
ভাসাইয়া দাও মোরে সর্বনাশস্রোতে।
জীর্ণ তরী ছিন্নরশি উল্কাসম যাক খসি
অকূল সমুদ্রে মত্ত জীবনের ঝড়ে।
কালবৈশাখীর মেঘে প্রাণ যেন ধায় বেগে,
শূন্য হতে বজ্রাহত ভূমে লুটে পড়ে।
অনন্ত পূর্ণিমানিশা স্বপ্নের মোহেতে মিশা,
বায়ু শুধু নিঃশ্বসিত কুসুমসুবাস,
বলো দুঃখ, কেবা চায় এমন জীবন হায়
অবেদন, অচেতন, ব্যর্থ, নিরাশ্বাস?
তার চেয়ে ক্ষণে জেগে দুরন্ত দুঃখের বেগে
প্রবল জীবনে ধাই ব্যাকুল উন্মাদ—

তখনই মৃত্যুর বুকে ঝাঁপ দিই মহাসুখে,
ক্ষণেকে বুঝিয়া লই জীবনের স্বাদ।
তোমার দুঃসহ জ্বালা যেন বিদ্যুতের মালা
কণ্ঠে পরি ঝঞ্ঝাসম ধাই দিগ্‌বিদিক,
মৃত্যুরে করিয়া সাথি প্রবল জীবনে মাতি—
বক্ষে ধরি যে যাতনা মৃত্যুরও অধিক।

দিন-রজনীর পিছে দিবস রজনী মিছে
নত নেত্রে চেয়ে যায় ধরণীর পানে।
গগনের গাঢ় নীলে স্মৃতিলেশ নাহি মিলে,
নাহি রয় চরণের চিহ্ন কোনোখানে।
ব্যর্থ জীবনের বোঝা, বৃথা আশা, বৃথা খোঁজা—
দিন মাস বর্ষ যুগ স্বপ্নই শরণ।
শুষ্ক হ্রদে বৃষ্টিহারা কমলবনের পারা
তৃষ্ণায় বিশুষ্ক শীর্ণ অন্তিমে মরণ।
স্নেহসখ্য ভালোবাসা পুষ্পকলি স্রোতে-ভাসা
ফুটিতে না ফুটিতেই মিলায় চকিতে।
তার পরে ভাগ্যদোষে শূন্য নদীকূলে ব'সে
কেটে যায় দীর্ঘ দিন ঢেউ গ'ণে দিতে।
ভাঙিতে চাহে না ঘোর— তখন হে দুঃখ মোর,
শঙ্করের শিঙারব বেঁধো মর্মে এসে।
যাতনায়-বিদ্ধ-হিয়া দুরারোহ পথ দিয়া
শিখর করিয়া লক্ষ্য ধাই গিরিদেশে।
প্রতিদিন প্রতিরাত্রি মহান্ লক্ষ্যের যাত্রী
অক্ষয় পাথেয় মহা-দুঃখ লয়ে ধায়।
দেবের আশিস্‌পুণ্য চুপে চুপে গ্লানিশূন্য
করে মনঃ প্রাণ তনু দীপ্ত বেদনায়।

তোমার বন্দনাগান গাহিবারে চায় প্রাণ,
হে দুঃখ, কম্পিত কণ্ঠে কাঁপিতেছে সুর।
সেই সুর তুমি লও, প্রাণের প্রাণেশ হও—
তব আলিঙ্গন লাগি বধূ যে বিধুর।
সুখ তুমি নহ নহ, দুঃখ তুমি সুদুঃসহ,
মনে হয় তুমি যেন নির্মম বৈরাগী।
জানি জানি তুমি তবু সুখেরও বল্লভ, প্রভু—
সুখ সেও কাঁদিতেছে তব পদ মাগি।
তোমার নূতন ধারা, যারে করো গৃহহারা
দানপত্রে লিখে দাও বিশ্বচরাচরে।
যার কেড়ে লও হাসি অশ্রুমুকুতার রাশি
মালায় গাঁথিতে দাও দেবতার তরে।
যারে ব্যথা দাও শোকে অন্ধকারে নিরালোকে
সারা আকাশের শান্তি প্রাণে নামে তার।
মৃত্যুর শীতল ঘুমে জাগাইয়া দাও চুমে,
মুক্ত করো জীবনের নব নব দ্বার।
সুখ স্বস্তি করো নাশ, শ্মশানে হোক-না বাস,
শিক্ষা দাও শব পেতে শক্তির সাধন।
এসো দুঃখ, এসো দুঃখ, নির্মম কঠোর রুক্ষ—
ছিন্ন করো আজন্মের সকল বাঁধন।

বৈদ্যপুর
৮ বৈশাখ ১৩৩৪

আমার ভুবনে

আমার ভুবনে প্রভাতের তারা মেলে অনিমেষ আঁখি।
আলোকের পথে কোথায় মিলায় নীরবে কি ডাকি ডাকি!
সন্ধ্যার তারা তেমনি নীরবে
অতিদূর হতে প্রণত এ ভবে
ধূলির কণায় কণায় কী যেন সান্ত্বনে দেয় ঢাকি!

আমার ভুবনে আলোকের ধারা বহাইয়া দেয় রবি।
সে আলোকে ভরা-পালের তরণী ভাসে নিখিলের ছবি।
আমারই হৃদয়-ঘাট হতে ভেসে
অকূলের কূলে কোন্ দূর দেশে
আমারই আরএক হৃদয়ের ঘাটে পার হতে চায় সবই।

আমার ভুবনে উর্ধ্বআকাশে তারকার গতাগতি।
দখিনা বাতাসে বসন্ত আসে সুখমন্থর অতি।
বর্ণ গন্ধ ধ্বনি অবিরাম
না জানি প্রিয়ের নিতে চায় নাম—
তাই ইঙ্গিত, আশা-অভিলাষ, ব্যথা-ব্যাকুলতা, রতি।

আমার ভুবনে শশধর হাসে, তারাগুলি কথা কয়।
কানাকানি করে প্রিয়নাম ল'য়ে কাননে কুসুমচয়।
'কোন্ অনুরাগে বিবাগি হইয়া
বাহির হইবে কোন্ পথে হিয়া'
নীরবে পুছিয়া চলে যায় সবে বিশ্বভুবনময়।

বৈদ্যপুর
৭ আষাঢ় ১৩৩৪

অভিসার

বারিবরিষণে রৌদ্ররাশি, কাঁদিছে হাসিছে মর্তভূমি।
তেমনি রোদনে তেমনি হাসি— খেলার ছলনে ভুলাও তুমি।
মম নয়নের অশ্রুধারা অজানা হে তব সিন্ধু-পানে
হাসির আলোকে ঝিকিয়া সারা বহে কুলুকুলু-আকুল গানে।
যুগ হতে যুগে এমনি বহে, জনমে জনমে চিরবিবাগি—
কার কানে কার বারতা কহে! কারে সাড়া দেয় কাহার লাগি!
বহুভঙ্গিম বিবিধ ছাঁদে অনন্ত এই নয়নলোর
আনন্দময় বেদনে কাঁদে! কবে শুরু হল কে জানে মোর!
বিস্ময়ে তাই গগনে আজি উদিল তপন চন্দ্র তারা,
ঘুমিয়া পড়িল ভুবনরাজি, হেরে দর্পণে আপন-হারা—

পরিচয় লাগি নেহারে হায় আপন আপন কাঁপন-ছবি!
অধীর প্রবাহে ভাসিয়া যায় দ্যুলোক ভূলোক তারকা রবি
মম প্রাণ-গলা প্রাণের টানে
অজানা অসীম সিন্ধু-পানে।

বৈদ্যপুর
২২ আষাঢ় ১৩৩৪

অনির্বচনীয়

নারিকেলকুঞ্জে আজি উজ্জ্বল প্রসন্ন রবিকরে
ঝিকিয়া স্বর্ণস্বপ্ন শ্যামবর্ণ প্রতি পর্ণ-'পরে
বিশ্রব্ধ এ মধ্যাহ্নের প্রতি ক্ষণে কহে কত কথা
ইঙ্গিতে আভাসে হাস্যে; জাগায় অপূর্ব অধীরতা
সুনীলদিগন্তশায়ী শ্যামশোভা বনে উপবনে,
অসীমরহস্যশায়ী মানবের মুগ্ধ মনে মনে
উচ্চকিত। আকাশের অন্তহীন নীলিমায় লীন
যে আলোক শান্ত নিরাধার, সেই আলো সারা দিন
প্রতি তরঙ্গের 'পরে, পল্লবের স্তরে, ঘাসে ঘাসে
ক্ষণমুক্তাকণিকায়, চোখে চোখে অহেতু উদ্ভাসে,
অধীরআগ্রহভরে বিচ্ছুরিত, সানন্দ, সুস্মিত,
অবিরাম আশায় শঙ্কায় যেন দোলায়িতচিত,
বেপমান, বিধুর, বিরহী। অসীমে সীমায় মিলে
একি অপরূপ লীলা চিরন্তন! রূপের নিখিলে
অরূপের অনিন্দিত হাসির আভাস অবতরি
একি সীমাহীন সুখ, সীমাহীন ব্যথা! মরি মরি,
শিশিরের বিন্দুতে বিন্দুতে বিরহের অশ্রুরাজি,
মল্লিকামালতীগন্ধে মিলনের আশাটুকু আজি
ফেলে মৃদুমন্দ শ্বাস; মুকুলিত পত্রের কাঁপনে
কত যুগ-যুগান্ত-কাহিনী চমকিছে বনে বনে

স্বপ্নময়ী স্মৃতি ; তরঙ্গের উত্থানপতনে নদী
কী আকুল আলিঙ্গন উদ্দেশে বিলায় নিরবধি
সেই প্রিয়জন লাগি যাহার আশ্চর্য নামখানি
চিরযুগযুগান্তর সর্বথা বলিতে হার মানি
অতিদূর রজনীর তারায় তারায় ছলোছলো
চেয়ে রয় মৌনের বেদনে।

বলো কবি, বলো বলো,
আভাসের ভাষা দিয়ে, অলৌকিক ছন্দের বন্ধনে
যেই সুগভীর সুখ, সুগহন ব্যথা, মনে মনে
এক আশা, এক অনুভব, অসীম-বিরহ-ভরা
অসীম মিলন একখানি পুষিছে সুন্দরী ধরা,
তারে তুমি কেমনে ধরিবে !

কমল বিকশি উঠে
সরসে সরসে ফুল্লশোভা ; পথের দু ধারে ফুটে
তৃণে তৃণে সুনীল কুসুম পথিকের সঙ্গ মাগে,
দক্ষিণসমীরে তাই দলে দলে অধীরতা জাগে ;
সারা বেলা তরুতলে আলোকছায়ালী শত শত
মুগ্ধশিশু শব্দহীন করতালি দেয় অবিরত
লীলায় মাতিয়া ; দিনান্তরঞ্জিত মেঘ ধীরে ধীরে
বর্ণময়স্বপ্নসম ভাসে নীল নভে, নদীনীরে
অধীর তরঙ্গহৃদে অস্থির স্বপ্নের শোভা দোলে।
পিক-পাপিয়ার কণ্ঠ সুনিবিড় কাননের কোলে
পঞ্চমে বাজিয়া উঠে ; সুপ্তোত্থিত প্রভঞ্জনঘাতে
আন্দোলি সহস্র শাখা অরণ্যানী কী উৎসবে মাতে,
উন্মত্তমর্মররবে চিরচারণের জয়ধ্বনি
প্রান্ত হতে প্রান্তে জাগে ; আষাঢ়ে বা শ্রাবণে যখনই
সজলজলদপুঞ্জ গাঢ়নীল ছায়া সঞ্চারিয়া
দিবসের মুখ ঢাকে, অন্ধ দিক চিরিয়া চিরিয়া

চমকে বৈদ্যুত দীপ্তি, মেঘমন্দ্রে গভীর গম্ভীর
তৃণরোমাঞ্চিত ধরা ; তমোঘোর বর্ষারজনীর
অদৃশ্য প্রহরগুলি রিমিঝিমি বারিবিন্দুপাতে
বিশ্বব্যাপী সুপ্তির শিয়রে বসি এক বেদনাতে
এক তানে বীণা বাজাইয়া চলে ; কভু বা ভ্রমর
উষাকালে মুদ্রিত কমলে জাগি মৃদুগুঞ্জস্বর
আলাপন করে মুগ্ধমতি ; ঝিল্লিঝঙ্কারের স্রোতে
স্বপ্ন রহি যায় সন্ধ্যা হতে ; বুঝি, তন্দ্রিত জগতে
কান পেতে শোনা যায় পুষ্পদলে শিশিরপতন,
তড়াগের প্রান্তে এসে চন্দ্রকর নাথের মতন
কুমুদকুসুমে চুমে, আকাশের অন্তহীন নীলে
অতিমৃদু নূপুরের রবে তারায় তারায় মিলে
অরূপের অভিসারে চলিয়াছে চিররাত্রি জাগি।

হায় রে চারণ কবি, কোন্ ভাব -প্রকাশের লাগি
চিরউদাসীর বেশে পথে পথে ফেরো ? অবিরত
ছুটে ছুটে বাহিরায় প্রাণ তব পাগলের মতো
প্রতি বর্ণ গন্ধ গান প্রাণের পিছনে ! ফুলে ফুলে
ডুবিয়া মেলে না তল ; সমীরে সমীরে সদা দুলে ;
আকাশের কূলে কূলে হিরণ কিরণে মিলে মিশে
দিশাহারা হয় ! জন্মে জন্মে কী ধনের সন্ধানী সে
আজিও বোঝে না, এত বর্ণ, এত রূপ, এত ছবি,
এতই ইঙ্গিত, এত গন্ধগান, গ্রহতারা রবি
নটবালকের মতো ছন্দে ধায় আনন্দিতচিতে
নীলকান্ত শূন্য ব্যেপে অনন্তেরে পরিক্রমা দিতে—
নিখিলের এ বিচিত্র লীলা দিবে না কবির মুখে
কেবল একটি বাণী ! জীবনের শত দুঃখে সুখে
গুমরিবে পঞ্জরে পঞ্জরে কেবল একটি আশা

হায় অনাহত সুর, ধ্বনি নাই, নাই তব ভাষা ;

হায় সুগহন, তুমি স্বপ্ন নও, নও তুমি মিছে,
দূর নও, পর নও; মর্মে মর্মে প্রত্যয় জাগিছে
প্রতি পলে প্রকাশিছ তুমি প্রতি দুঃখ, প্রতি সুখ,
প্রতি রূপ, প্রতি ভাব— প্রতি হৃদি অধীরউৎসুক
হৃদয়ে ধরিয়া তোমা শূন্যে শূন্যে বৃথাই কি ঢুঁরে !

শ্যামবর্ণ দলে দলে নারিকেলনিকুঞ্জে অদূরে
ঝিকিমিকি ঝিকিঝিকি রবির কিরণে সারা বেলা
ইঙ্গিত আভাস হাসি সারা দিন করিতেছে খেলা।

বৈদ্যপুর
২৯ আষাঢ় ১৩৩৪

গান

আমি সদাই খুশী রব তোমার খুশি-পানে চেয়ে।
আমি যে হাল ছেড়ে দিলে তুমি তরী বাইবে নেয়ে।
মণি মানিক রত্ন সোনা
নাহয় কিছুই জুটিল না,
দুটি নত নয়ন-পাতে শুধু তোমার নীরব হাসি—
করে তোমার করপরশ, বন্ধু, আমি ভালোবাসি।

চেনা কূলের নিকট হতে নিলে আমায় কোন্ অকূলে!
মেঘে-লেখা সন্ধ্যাদেশের রঙে রঙে নয়ন ভুলে।
সে শুধু হয় মায়া যদি,
এই নীলিমাই নিরবধি,
এই আকাশে এই সাগরে নাহি দিবস নাহি যামী—
চোখে চোখে চির-চাওয়ায় চেয়েই রব তুমি আমি।

বৈদ্যপুর
১০ ভাদ্র ১৩৩৪

সোনার কাঠি

হৃদয় মম সোনার কাঠি হৃদয়েরই রাজার হাতে,
পরশে তার ধূলা মাটি পরিণত হয় সোনাতে।
পরশ-আতুর অনুরাগে, হৃদয়-রাজা চলে যত,
অন্ধকারের বুকে জাগে তারায় তারা লক্ষশত।
পূর্বদিকের ললাট-তলে সোনার কাঠি ছোঁয় যেমনি
সোনার রাগে ঝলোমলে নূতন দিনের দিনমণি।

শিউরে উঠে তৃণে তৃণে পলকেতে জাগল ধরা।
ফুটল কুসুম আয়াস বিনে প্রাণে-পুলক-মধু-ভরা।
শাখীর ঘন শাখা দোলে, বিহঙ্গ গায় আপন-হারা।
ছুটল মৃগ বনের কোলে, পাষাণ টুটে উঠল ধারা।
ঘুমে-ভরা সজন লোকে ছিল বিজন নীরবতা,
সোনার কাঠি চোখে চোখে বুলিয়ে দিল হরষ-ব্যথা।
অচেতনের অণুরেণু চরণ-ধ্বনি শুনল কানে—
চিরদিনের নীরব বেণু বাজল নিতল নীলের প্রাণে।

কী জানি কোন্ গহন হতে কোথায় তুমি এলে প্রিয়,
অন্তহারা দূরের পথে! এই কথাটি বলে দিয়ো
কোন্ নিরালা নিলয়-তলে প্রিয়া তোমার মগন ঘুমে—
মুদিত তার নয়ন-দলে কুসুম-সম কোমল চুমে
সেই তোমারই চুমার 'পরে ছোঁওয়াবে কি হৃদয় মম?
সেই নয়নে সেই অধরে জাগবে হাসি স্বপন-সম—
মোহ হতে জাগবে প্রিয়া প্রিয়ের দুটি বাহুপাশে,
সোনার কাঠি হাতে নিয়া হেরবে মৃদু মধুর হাসে!

বৃন্দাবন
৪ চৈত্র ১৩৩৪

আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি

কাননের ফুল্লতরু আনন্দের ছবি
নেহারিয়া কবি
আনন্দিতচিতে
আনন্দবন্দনা এই রচি দিল গীতে।

মাটির প্রণয়ে ওই আকাশের উদাস নীলিমা
লাজের শোভায় যেন রাজিল রে সবুজে সবুজে।
মাটির প্রাণের আশা ভাষাহারা নাহি পায় সীমা
বিটপীলতায় তৃণে অসীমের প্রেম খুঁজে খুঁজে।

নিপুণ প্রাণের করে একতারা শুধু এক সুর
বকুলে চাঁপায় নীপে ফুলে ফুলে বাজায় মধুর।
শুনি সেই বাউলের গানে
গহন মানসে সদা আকাশের কী হয় কে জানে!

স্বর্গ হতে দেবতারা মহাদেবে পূজিবার লাগি
সাজায়ে গেল কি অর্ঘ্য আনন্দিত সিন্ধুতটে-তটে!
কোথায় পশিল ভোলা, ভান করি হইল বিবাগি—
হাসির আভাসে, মরি, ফুলে ফুলে সেই বার্তা রটে।

নিখিল আনন্দধারা অলক্ষিতে উছলে আবেগে,
কুলুকুলু কলোকলো অনাহত ধ্বনি ওঠে জেগে।
ঢেউগুলি ভেঙে পড়ে ধরণীর শুদ্ধ কূলে কূলে—
নীল পীত শুভ্র ফেনা লুটায় রে শুচি ফুলে ফুলে।

সুগহন আনন্দের অপরূপ হাসি
মুঠা মুঠা কুড়াইয়া অতিসুখ লাগিয়া উদাসী
গহনের ধনে
উৎসৃজিল তরুরাজি জ্যোতির্ময় গগনে গগনে।

সুন্দর ফুলের রূপ'সুষমায় অসীমের খুশি
জাগিয়া উঠিল, মরি, নিখিলের বিমুগ্ধ নয়ানে।

ডুবিয়া মেলে না তল— ভাষাহারা মানুষ মানুষী
ফুলের অঞ্জলি ভরি দুরুদুরু বক্ষোমাঝে আনে।

ক্ষণেকের লাগি
প্রেমের নয়ন ভরি চিরন্তনে হেরে অনুরাগী।

পালপাড়া। চন্দননগর
আষাঢ় ১৩৩৫

শিশু

কী জানি কী ভাবে শিশু পথের ধূলায় একাকী উন্মনা।
পল্লবে পল্লবে আলো তূলিকা বুলায়,
তৃণে ঝলে শিশিরের কণা!
আজি এই আশ্বিনের দিন
বনের শ্যামলে ঘেরা, আকাশের নীলিমায় লীন!

স্নেহের নিভৃত নীড় মাতৃঅঙ্ক হতে
ওরে বাছা, কে তোমায় আনিল আলোতে—
পথের ধূলায় দিল আনি?
সত্য একি, স্বপ্ন একি, নাহি পাই সীমা!
তারে কি ঢাকিল তার আপন মহিমা—
অন্তরের অন্তরালখানি?

ওরে বাছা, ধূলায় যে গড়িতেছ ধূলির প্রাসাদ,
ভাঙিয়া দিতেছ বার বার,
পথিকের কত আশা কত সুখ কত পরমাদ
কত প্রাণ প্রণয়ের ভার
ধূসর করিয়া দিল নগ্ন প্রাণ নগ্ন তনু তব—
ধূলার কামনা, মরি, নব প্রাণ, তনু নব নব।

গেহ যেন মনে নাই, মনে নাই জননীর কোল?
তরুতলে ছায়ালোক চুমে ভাল, চুমিছে কপোল

চমকি চকিতে!
কে যেন কহিল 'বন্ধু'! ছুঁয়ে যেন গেল অলক্ষিতে!

কেমনে আপনা ভোলো, ওরে বাছা, নাহি পাই ভেবে—
মনে হয় তাই যেন রাতুল ও পদতলে এবে
কত যে ত্রিদিব যায় লুটি!
কমলকুঁড়ির মতো ক্ষুদ্র তব মুঠি
ভরা আছে কুবেরের ধনে!
কে তোমারে কোলে ধরি আছে গো গোপনে!

নয়ননন্দন শিশু নির্জন প্রভাতে
বসিল রে নিখিলসভাতে
কত যেন দেবতার চোখে,
কত যেন লোকের আলোকে।

কলিকাতা
১৪ আশ্বিন ১৩৩৬

শুক্লা একাদশী

আজি শুক্লএকাদশী তিথি
দৃষ্টিতে উচ্ছল তব অন্তহীন প্রীতি—
হে সুন্দর, মূক বধূ তোর এ প্রকৃতি
স্বপ্নসম হয়েছে সুন্দরী।
মরি মরি!

তাহে কেন পাপিয়ার সাড়া?
হেন নিদ্রাহীন শশী, নিদ্রাহীন তারা—
আকাশবাহিনী শেষে মুক্তসুধাধারা
মুক্ত মোর বাতায়নোপরি।
মরি মরি!

কলিকাতা। ১৩৩৭

অমৃত

শ্মশানে মশানে ফুটে ধুস্তরকুসুম—
ম্লান তো করে না চিতাধূম,
মোহ শোক নাই তার চিতে
হাসিতে হাসিতে
ভোলা প্রাণ ভোলা দেবতারে করে গো বরণ।
মরণ! মরণ!
শুনেছ? সে দেবতার কানে কানে কয়,
'নগ্নবেশী হে সুন্দর! ওহে মৃত্যুঞ্জয়!'

জাতিতে জাতিতে যবে হানাহানি করে,
শূন্যপুরী শূন্যপথ শূন্য ঘরে ঘরে
বিধবার বেশে যেন ফিরে ফিরে যায়
বোবা হায়-হায়,
কোথাও কি অবোধ বালিকা
ঝরা বকুলের ফুলে গাঁথিয়া মালিকা
পুতুল বর ও বধূ করে না বরণ?
মরণ! মরণ!
শুনেছ? খেলার ছলে করে নিবেদন,
'বাসনাবেদনাহীন হে ঠাকুর! হে খেলার ধন!'

তেমনি আমার প্রাণ— সেই শিশুচিত
সুরে সুরে সদাই চকিত,
অশ্রুমতী শ্রাবণের নীল মায়া লাগি
প্রতি সন্ধ্যা হয় যে বিবাগি,
পথিক-পায়ের চিহ্ন আঁকা যে ধূলায়
তৃপ্তিহীন নয়ন বুলায়,
সংসারের সুখে দুঃখে কাজে নাহি লাগে—
সুখ দুঃখ সেই প্রাণে জাগে

সুধাময় সুচিরস্মরণ।
মরণ! মরণ!
হায়, সে যে আনন্দের দেবতারে দিতে
জীবনের পাত্রখানি ভরিবে অমৃতে।
শুনেছ? দেবতা-পানে চেয়ে চেয়ে কয়,
'হে আনন্দময়!'

শান্তিনিকেতন
২৫ শ্রাবণ ১৩৩৭

গান

পথের ধারে রই বসে রই। প্রাণসখা, ডাকবে তুমি।
তোমার চরণ ব'লে, সখা, প্রতি চরণ-চিহ্ন চুমি।
নয়ন আমার মধুপ হয়ে
উড়ে বেড়ায় রয়ে রয়ে—
মধুবায়ু, মধুর আকাশ, মধু ধূলিধূসর ভূমি।

ওগো, আমার নেই কিছু নেই। আলোছায়ার ইশারাতে
মোরে তুমি কী ধন দিলে? ধরে না মোর দিনে রাতে।
তোমার একতারাটির তারে এবে
তুমি আমায় যে নাম দেবে
তারই আশায় আকাশে চাই, অলখ পাদপদ্মে নুমি।
পথের ধারে রই বসে রই। কবে আমায় ডাকবে তুমি?

বৃন্দাবন
৪ আষাঢ় ১৩৩৮

চিরবিরহী

অয়ি প্রিয়া
আজন্মের চুমা মোর দিব না আঁকিয়া
উন্মুখ অধরে তব। শুক্লা একাদশী;
অবাক্ চাহিয়া থাক্ শূন্যে ওই শশী।

বিফলে, বিরহী ফুল শ্বাস ফেলে যদি
বিজন বিপিনে। সব স্বপ্নের অবধি
তোমাতে নেহারি মোর অধীর হৃদয়
যদিবা অধীরতর এ নিমেষে হয়
দিব না অধরে তব, ও মোর প্রতিমা,
এ জন্মের চুমা মোর। সব সুখসীমা
নহে সে কি ? আকাঙ্ক্ষার সীমা সেই বটে

কোন্ সমুদ্রের তীরে, কোন্ শৈলতটে,
লোকান্তরে যেন কোন্ জাহ্নবীর বুকে—
ঊর্মিগুলি স্বপ্নে আলা, স্বপনের সুখে
অলস তরীর পাল, এইমতো শশী
স্বপ্নে হাসিতেছে একা মহাশূন্যে বসি—
স্বপ্নে হেরিতেছি যেন কত বার বার
চুমা-বিনিময়, প্রিয়া, তোমার আমার।

মনে পড়ে ? পাষাণের সোপানের 'পর
মণিমুক্তা ছিটাইয়া ঝরে নিরন্তর
নির্ঝরিণী, কেলুবনে মৃদু সমীরণে
মৃদুল মর্মরবাণী, অবশ স্মরণে
বিগত সুখের সম পুষ্পপরিমল
সহসা উচ্ছ্বসি উঠে। পবিত্র অমল
আলো অন্ধকার। সেই মধুর পবন,
মধুময় জলস্থল আকাশভবন,
স্মিত প্রভাতের তারা, সিতদ্বিতীয়াতে
নখরে কে দাগ দিল— দিব্য পদপাতে
কষিতকাঞ্চনরেখা। জন্ম জন্মান্তর।
বনচর। মরুবাসী। প্রথা স্বতন্তর
পথপ্রিয় পথিকজীবনে। বার বার
পাওয়া ও হারানো, প্রিয়া, তোমার আমার

কতই তো চুমিয়াছি ; চুম্বনের সাধ
মেটে না, মেটে না তবু। বাসনা উন্মাদ
থরোথরো-কম্পমান ওষ্ঠাধর দুটি
রক্তিম অধরে ধরে, নিমেষেই ফুটি
মর্তমন্দারের কলি নিমেষেই টুটি
কোথায় হারায় সখী !

চেয়ে দেখেছ কি ?—
তোমার আমার মাঝে ফুটে আছে প্রিয়া,
অন্য ওষ্ঠাধর, অন্য দৃষ্টি মোহনিয়া,
অন্য সকৌতুক হাসি, অন্য কোন্ আশা,
বুঝি কোন্ দেবতার অন্য ভালোবাসা !
যুগলের আলিঙ্গনে নিবসে একাকী
দৃষ্টিবিনিময়ে যারে হেরিল না আঁখি,
যার চুমা মেগে নিয়ে যাহারে চুমিতে
ভুলেছিনু। তারই ছলে লুটায় ভূমিতে
শতজীবনের সাধ, শতেক প্রণয়।
ব্যাকুল-আশঙ্কা-আশা-স্বপ্ন-স্মৃতি-ময়
হায় ইহা প্রেম নয়, প্রেম নয় নয়।

এ জন্মের চুমা নিয়ে তাই এ সন্ধান
এ জন্মের পূজা, তার কই অবসান !

রাধাকুণ্ড
১২ আষাঢ় ১৩৩৮

কথা ও সুর

কথা বেশি কিছু নয়। সুর একটুক
যাচিয়া ফিরেছি পথে আশ্বস্ত উৎসুক

দু হাতে তুলিয়া ধরি ছিদ্র-করা বেণু
বক্ষের নিকট। আলো অন্ধকার পেনু
আকাশের স্বপ্নে জাগরণে, সুপবন
অঙ্গে দিল পরশহিল্লোল, চূতবন
মঞ্জরী ঝরালো শিরে বসন্তের দিন,
আকন্দ সে ভস্মভূষা সন্ন্যাসী নবীন
গন্ধ দিল গোপন প্রাণের, কী আবেগে
শিখী দিল নৃত্যউপহার, সন্ধ্যামেঘে
মল্লিকার মালা দিল দোলাইয়া একি
চকিত বলাকাপংক্তি, তৃণে তৃণে দেখি
নিখিলআলোকে বুঝি নিখিলসংসার
শিশিরেই ঝলোমলো— নারী দিল তার
সচুম্বন প্রীতি আর বক্ষে দিল ঠাঁই
সুদিনে দুদিনে বন্ধু।

বলো কোথা পাই
সুর তব হে নিখিল। সুর কই দিলে?
বলে আলোঅন্ধকার বায়ুবৃষ্টি মিলে,
বলে পুষ্প পাখি শাখী, বলে পথধূলি,
বলে দুঃখ সুখ প্রীতি রক্তে ঢেউ তুলি—
সুর দাও! 'সুর দাও' বলে রাত্রি দিন!
একি পরিহাস হায়! আমি সুরহীন।

কিছুই সে নয় — কথা গাঁথিয়াছি বটে।
দু হাতে তুলিয়া ধরি বক্ষের নিকটে
ছিদ্র-করা শূন্য বেণু শঙ্কিত বিধুর
যাচিয়া ফিরি গো পথে একটু সে সুর।

রাধাকুণ্ড
২০ আষাঢ় ১৩৩৮

মুকুর

জীবনের বিফলতা মম
নিগূঢ় বেদনা
সঁপিনু পথের প্রান্তে নবদূর্বাদলে
অশ্রুসম, শিশিরের সম।
ঝলোমলি উঠে যেন নিখিলভুবন
একবার এ ক্ষণমুকুরে!

দম্‌দম্‌ জেল
২৪ চৈত্র ১৩৩৮

কিশোর

চিবুক তুলিয়া ধরি মুখ হেরি তোর
কী দেখিনু হে নবীন বন্ধু, হে কিশোর!
দুটি নেত্র দুটি যেন শুকতারা তব,
সুন্দর ললাট-'পরে প্রভাত কি নব
প্রভা দিল! হে কিশোর, এ মোর জীবনে
যারা দেখা দিয়েছিল কৈশোরে যৌবনে
প্রাণের প্রাঙ্গণে, মনের নিভৃত ঘরে,
পরিল জ্যোতির রাখী, পরাইল করে
স্মিতমুখে, একা এল, একা গেল যবে
প্রাতঃসন্ধ্যা শেফালি ও বকুল -বৈভবে
যাদের চরণচিহ্ন পূজে বনভূমি
প্রতিদিন, বিস্ময়ে হেরিনু সেই তুমি—
সেই তুমি, অধরে নূতন হাসি হেসে
চিরপরিচিত এলে কী নূতন বেশে
নিজেরে চিনাতে! কালো চক্ষুতারকাতে
ঘনায় তোমার, প্রিয়, প্রিয়জন-সাথে
যতবার যত পরিচয়, চোখে চোখে
যত নাম ধ'রে ডাকা, অন্তরআলোকে
অহেতুক হাসাহাসি যত।

চেয়ে তাই
তব মুখে, ভুলিনু কে তুমি ; সীমা নাই
তোমার রূপের। বন্ধু, নয়ন মুদিয়া
মনে হয় মুগ্ধ ধ্যানে, এলে কি উদিয়া
ভূতভবিষ্যের তুমি সমুদ্রমন্থনে !
লোক লোকান্তর হতে যারা এ জীবনে
আজও আসে নাই, যারা কভু আসিবে না
জাগরণলোকে, স্বপ্নে শুধু হবে চেনা,
প্রভাতসন্ধ্যার তারারূপে
দূর হতে কিরণচুম্বনে চুপে চুপে
চুমিবে জীবন, হবে পরানের প্রিয়—
সে-সবার প্রীতিস্পর্শ লয়ে এলে কি ও
তোমার প্রাণের স্পর্শে তব চক্ষে মুখে !
নিখিলের মূর্তি তুমি, হেরিনু কৌতুকে
তুমি একা নিখিলের বুকে।

দম্‌দম্‌ জেল
২৭ শ্রাবণ ১৩৩৯

শ্রাবণ

তটিনীর ঊর্মিমালা ফিরে ফিরে ধীরে ধীরে এসে
তটভূমি চুমিছে সোহাগে।
নবীন ধানের মাঠ রমণীয় স্নিগ্ধশ্যাম বেশে
চৌদিকে দিগন্ত জুড়ি জাগে।
কভু মেঘাঞ্জনে লিপ্ত, কভু সিত বাষ্পের গুণ্ঠনে
অভিনব ঊর্ধ্বে নীলাকাশ।
প্রস্ফুটিত কেতকী ও কদম্বের পরাগ'লুণ্ঠনে
সুরভিত পবনউচ্ছ্বাস।

দিবানিশা প্রাতঃসন্ধ্যা বর্ষণের ধারায় ধারায়
কভু বুঝি লুপ্ত একাকার।

চঞ্চল বকের পংক্তি নিরুদ্দেশে কোথায় হারায়,
ভাবে বালা বাতায়নে তার।
কভুবা মেঘের প্রান্তে দেখা দেয় ক্ষণকালতরে
বিকালের আলো স্মিতমুখী—
শালবনে তালবনে স্বর্ণতূলি বুলে চারু করে,
দুলে ওঠে কাশ সে কৌতুকী।

বাজে না রাখাল-বেণু, হাম্বারবে দিবসের শেষে
গোষ্ঠে ফিরে আসে ধেনুদল।
মেঘের পাথারে মুদে একবার ম্লান হাসি হেসে
দিনান্তের আরক্ত কমল।
জনশূন্য পথ চেয়ে দুয়ারে বালিকা অন্যমন,
সহসা শঙ্খের রবে জাগে—
আনে আপনার পূজা দীপ জ্বালি জননী যখন
তুলসী পূজেন অনুরাগে।

কিছুক্ষণ আলো করি শ্যাওলায়-সবুজ অঙ্গনে
মৃন্ময় প্রদীপ দুটি হাসে।
ত্রিযামা যামিনী লেখে খদ্যোতঅক্ষরে বনে বনে
মনে মনে কারে ভালোবাসে।
লুপ্তপথ শূন্যে কোথা চলিছেন মৌনী মহাকাল,
ঝড়-ঝঞ্ঝা লুটে দিশি দিশি—
কী দিয়ে সাজায় কারা ধ্রুবলোকে অর্চনার থাল,
যাত্রা তাঁর হেরে সপ্তঋষি।

আশার অতীত ধন ছিন্ন মেঘে স্মিত শুকতারা
লভিনু প্রভাতে পথে ছুটে।
হে শ্রাবণ, আজি তব আকাশ বাতাস এ আমার
প্রাণের বেণুতে বেজে উঠে।

২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯

কিশোর বন্ধুকে

গুণী নহি, জ্ঞানী নহি, কবি নহি ভাই,
ধূলা বড়ো ভালোবাসি— পথ-'পরে তাই
যাপি দিবা-বিভাবরী। খ্যাপার মতন
মুঠি-মুঠি ধূলি চুমি ; মণি ও রতন
করি না কামনা। ক্ষণস্থায়ী অশ্রুহাসি
ভাবনাবেদনা মম ; আমি যে উদাসী
অকারণ।······

কেন হায় পথের বাউলে
ভালোবেসেছিলে বন্ধু ? মুগ্ধ আঁখি তুলে
মুখ'পানে চেয়ে চেয়ে কহ নাই কথা।
তমোঘন অরণ্যেতে রৌদ্রখণ্ড যথা
মৌন তব বাণী। করের পরশ তব
কী আশ্বাস, কিবা আশা! প্রাণে নব নব
স্বপ্নের কুসুমকলি।······

দেবআশীর্বাদে,
পথভ্রান্ত স্বর্গশিশু, ক্ষুদ্র সুখসাধে
বিসর্জিয়া অকাতরে, জীবন তোমার
জ্যোতির্ময় স্বর্গে যেন জাগে পুনর্বার—
সাধনায় স্বর্গ যেন নামাইয়া আনে
ধরার ধূলার মাঝখানে।

দমদম্ জেল
১ ভাদ্র ১৩৩৯

আলোছায়া

নীলাকাশে সাদা মেঘ,
নারিকেল-গুবাকের দীর্ঘ পাতাগুলি

আলোছায়ে ঝিল্‌মিল্ করে,
হিল্‌মিল্ হাওয়া বয় :
বেলা যায় মুগ্ধমনে চেয়ে চেয়ে।
এসেছি অনেক দূর হতে,
যাব বহু দূরে
এ-সকল কথা আজ মিথ্যা মনে হয়।
আকাশপ্রান্তরে এই অতিথশালাটি
এক বেলাকার,
এত মন ভুলাতেও পারে!

বালিগঞ্জ। ১৩৩৯

পূজা-প্রেম

অনূদিত

পূজি আমি রবিদেবতারে…
আলোকের বাঞ্ছা নাই,
সে আলোয় বিপিনে বিপিনে যেই ছায়া আঁকা
সেই তো বাঞ্ছিত।
অয়ি ছায়া,
নন্দননিকুঞ্জ-হেন
সুস্নিগ্ধ-স্বাগত-ভরা তব স্নেহাশ্রয়ে
নিদাঘের দিবাস্বপ্ন মোর
কায়া ধরি উঠে মুঞ্জরিয়া।

প্রেমপ্রত্যাশায় নহে,
তাহার প্রেমের স্মৃতি কামনা করিয়া
রমণীরে ভালোবাসি ভাই।
থাকুক প্রেমের মৃত্যু
স্মৃতি তবু সুচির নবীন হৃদয়ে আমার,
মধুঋতুমধুরআবেশ
যে অমৃতকূপে আমি নিত্য করি পান।

গীতপুরস্কার নয়,
আমি যে বিহঙ্গস্বরে কান পেতে রই
নিঃশব্দতাঅভিলাষে গীতঅবসানে।
শব্দের হৃদয় হতে হে সদ্যপ্রসূত নিঃশব্দতা,
মরণলোকের তুমি শোনাও কী সুর!
চিরদিন আমি চেয়ে রই সেই মৃত্যু-পানে।

৬ আষাঢ় ১৩৪২

আলোক-আসার

অকালের ঘনঘটা
ঘিরে আছে বৈশাখী বিকালটিরে :
বৃষ্টিছলোছলো দশ দিক।

গুণ্ঠন সরায়ে ফেলে পশ্চিমে সহসা
হাসিল প্রসন্ন দিবা :
বাঁকা ছাঁদে পড়িল আলোক বিশ্রব্ধ ভুবনে
গলিতকাঞ্চন-হেন।

ধৌত পথে সার-বাঁধা
অশ্বত্থের বৃষ্টিধৌত পুঞ্জিত শ্যামিমা,
ধৌত সব রুদ্ধদ্বার গৃহ ও বিপণি,
ক্বচিৎ পথিক দেখা যায়,
শিশু খেলা করে এসে মা'র কোল ফেলে,
গোষ্পদসলিলে
কলরবে স্নানলীলা করে শালিখেরা :
পরিচিত নগরীর রূপ
অপরূপ আলোকে ছায়ায় :
হাস্যউন্মুখর আলো,
নিয়তসঙ্গিনী ছায়া সাশ্রু মৌনমুখী!

দিগন্তের কোল হতে বহিছে পবন।
অশ্বত্থের ছায়াচ্ছন্ন শাখায় শাখায়
মর্মরঝটিকা বাজে,
জ্যোতিঃপ্লুত শিখরে শিখরে
খণ্ড খণ্ড ধূপছায়াচয়
উন্মদসঙ্গীতমূর্চ্ছনায়
মূর্ছে গায়ে গায়ে।
বায়ু ইন্দ্র দিবাকর
ত্রিদিব ত্যজিয়া এল আজ
(ইন্দ্রত্যক্ত সুবিচিত্র চাপ
চুম্বিল আকাশপটে দুই দিক্‌সীমা)
ধরণী স্থাপিল তাই পথের দু ধারে
শততার বীণাযন্ত্র।
সে বীণাঝঙ্কার, মরি, সে সঙ্গীতস্বর
কানেও লাগে না, তবু
সর্বাঙ্গেও কিছু লাগে যেন :
মূঢ় শ্রুতি,
দৃষ্টি আজি দেহ আজি তাই
শ্রুতিময় হয়েছে আমার।

প্রাচীপটে নিবিড় জলদে
উজ্জ্বল কজ্জলরাগ
দূর বটে,
দূরতর সৌন্দর্যে নির্বাক্ :
নির্বাক্ তাহাতে আঁকা একটি পাদপমূর্তি,
নিষ্পত্র, ভিখারি,
রাজরাজেশ্বর-হেন আজি যার
কিছুতে দৃক্‌পাত নাই।
অবসানদিবামুখে মেঘাবগুণ্ঠন
আবার পড়িল নামি,

মিলালো আলোক :
গাঢ়তর ছায়ানাট্যভূমে
বায়ুবৃষ্টি মাতিল তখন।

বোলপুর
৭ আষাঢ় ১৩৪২

বিল্বকুসুমের বাস

ঝর্ঝরি ঝরিছে বারিধারা
তন্দ্রাতুর শালবীথিকায়,
কাঁকরের পথে।
রুদ্ধদ্বার গৃহশ্রেণী,
ক্বচিৎ আলোক ঝলে
মুক্ত বাতায়নে যেথা
বিদেশীয় বন্ধু জেগে আছে :
সমুদ্রপারের দীর্ঘশ্বাস
ঝাউবনানীর হুহু-হাহাকার লয়ে
আম-জাম-বকুলের তমোঘন বিজন প্রদোষে
ফিরিছে তাহারে ঘিরে ঘিরে।

বৃষ্টি ঝরে। বৃষ্টি ঝরে অশ্রান্ত সঙ্গীতে
সুপ্ত শালবীথিকায়,
নতশীর্ষ বনে :
কলস্বরে বারিধারা ছুটিছে চৌদিকে।
স্ফুরদ্‌বৈদ্যুতালোকে একা কে পথিক
চলিয়াছে মাঠ-পারে অন্য কোন্ গ্রামে।
বিল্বকুসুমের বাস বাদল-বাতাসে
সহসা উচ্ছ্বসি কোথা হতে
মাদক মধুর তিক্ত সুখে
বিহ্বল করিল চিত্ত অতিদূর শৈশবস্মরণে :

প্রভাতী নৌবতে ভৈরবীর স্বর,
গোধূলির শাঁখ,
দেবালয়ে আরতির ধ্বনি,
ভক্তিপূত জননীর মুখ,
জননীর পূজা,
চাঁপার কনকাঞ্জলি জাহ্নবীর প্রবাহে ভাসানো।

বোলপুর
১৪ আষাঢ় ১৩৪২

ঝঙ্কার

গোপীযন্ত্র ঝঙ্কারিয়া পথে কে বাউল
কী গাহিছে গান।
বৃষ্টিধৌত নবীন প্রভাতে
ছিন্নমেঘে ক্ষণে ক্ষণে নবরৌদ্ররাশি
উচ্ছলিছে দিকে দিকে,
ক্ষণে ক্ষণে স্নিগ্ধছায়া লুণ্ঠিত ভুবনে—
দিগন্তে কানন-ঘেরা কৃষকের গ্রাম
সে আলোছায়ায় হেরি
শিশুহেন সুষুপ্তিআবেশে করিছে দেয়ালা।
মধুমালতীর কুঞ্জে অজস্র কুসুম
দুধে-আল্‌তায়-ছোঁওয়া প্রগল্‌ভ শোভায়
স্তবকে স্তবকে দুমে, পূবালি পবনে
উঠে আন্দোলিয়া।
কামিনীকুসুমহাস কুটীরঅঙ্গনে
দিবসচন্দ্রিকা-হেন
বিকশিছে ঘননীল পল্লবের থরে,
ঝরিছে ভূতলে।

গোপীযন্ত্র ঝঙ্কারিয়া পথে কে বাউল
কী গাহিছে গান।

বৃষ্টিধৌত এ প্রভাতে আলোকে ছায়ায়
যেই মুগ্ধ মূক লীলা অসীমে অসীমে
কী ভাষা পেয়েছে সেও কী পেয়েছে স্বর
পঞ্জরপিঞ্জরে তাই বিহঙ্গ আমার
শোনে কান পেতে।

বোলপুর
১৬ আষাঢ় ১৩৪২

স্বপ্ন-সত্য

স্বপ্ন শুধু মানবজীবন জানি বন্ধু, জানি।
অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যৎআশা
বিমোহিনী মরীচিকা সমুখে পিছনে···
সত্য সে তো নয়।

জঠরের ছিন্ননিধি জনমপ্রত্যূষে
আমারেও মা আমার অঙ্কে তুলে লয়ে
দৃষ্টিপাতে করেছে চুম্বন,
অভিনব উষাসম ঘিরেছে তাহার
মৃদুহাসিখানি।
প্রাণ হতে প্রাণ পিয়ে তারই বুকে কোলে
দিনে দিনে হয়েছি লালিত।
সেই মা কোথায় ?
মায়ের সে স্নেহ ?
কোথা শৈশবের সঙ্গী ? শিশুর খেলোনা
আচ্ছাদিল কোন্ ধূলি ?
সেই বেল সেই চাঁপা বিস্রস্ত বকুল
রবিশশীতারারশ্মি
রূপ ধরি এ জীবনে যারা এসেছিল
দিনযামিনীর পারে যবে উত্তরিল
ক্ষীণতম সৌরভের রেশ এ বাতাসে
রহিল না।

নিসর্গের স্বপ্নভূমিকায়
স্বপ্ন যদি নাই হবে এ মরজীবন
নির্বাপিতদীপ তবে পূর্ণিমানিশীথে
পাপিয়ার উচ্ছ্বসিত গীতের বিরামে
চিবুকাগ্রে তুলে ধরি
প্রেমময় মুখ
যতই সুন্দর
তত কেন দূর মনে হয় ?
মেলে না পরশ মুগ্ধ চুম্বনে চুম্বনে।
ব্যর্থ আলিঙ্গন ফিরে আসে।
আলিঙ্গনে কে বেঁধেছে আলো
কে বেঁধেছে প্রেম
কে বেঁধেছে প্রিয়ারে তাহার ?

প্রান্তরের দূর প্রান্তে নীরব আকাশে
সন্ধ্যা যায় ধীরপদে।
বিলুণ্ঠিত আলোকঅঞ্চল
শ্যাম তৃণভূমি ত্যজি,
শিবালয়চূড়া চুমি, অরণ্যশিয়রে
শেষ স্পর্শ দিয়া
মেঘেতে মিলায় : অনন্তের অভিসারিণীরে
নির্নিমেষ শুক্র হেরে ঊর্ধ্বে সমাসীন।
সে মুহূর্তে মনে হয় অরুণে কাঞ্চনে
নীল শুভ্র সবুজের মূর্ছনায় মিলি
কী সঙ্গীত উঠিতেছে নিখিল গগনে।
সুরের পরশ
ত্রিদিবদুয়ার খুলি ক্ষীরোদের তটে
অলোককমলালয়া আলোকরূপিণী
কমলারে ঘেরি
সুরসভা প্রকাশিবে বুঝি !

মিথ্যা আশা! বধির শ্রবণ!
অন্ধ দৃষ্টি হেরে শুধু রাত্রির আঁধারে
অগণ্য যুগের অশ্রু
জ্বলিছে, ঝলিছে'!

দিন যায়, বর্ষ যায়, যুগ যুগান্তর।
জলে-স্থলে গ্রহে-তারকায়
কোথা জীব নাই, নাই জীবনের লীলা
দুঃখে-সুখে-অপরূপ
জন্মমৃত্যুরহস্যে-সুন্দর?
অন্তহীন দেশকাল। নিখিল মানব
তটাহত প্রাণউদধির
ক্ষণস্থায়ী একটি লিখন,
একএকটি ফেনাক্ষর তুমি আর আমি।
বিন্দুমাঝে সিন্ধু আছে শুনি।
শুনিয়া কি তৃপ্ত হয় হৃদি?
শুনিয়াছি কত কথা কতই কাহিনী—
কত দেবঅবতার
অযোধ্যায় বৃন্দাবনে আরবে মিশরে,
যমুনা-জর্ডন-জলে নৈরঞ্জনাতীরে
প্রেমে পুণ্যে বার বার
মানবের দেবঅভিষেক।

ত্যজিয়া আপন লোক দেবের অগ্রজ
সপ্তর্ষির কেহ আজি নীলোদ্‌বেল কোনো সিন্ধুকূলে
কোনো ধ্যানে মগ্ন নাই
একদিন করিতে আহ্বান?—
'শুন মৃত্যুভীত নর,
'অমৃতসন্তান জেনো তোমরা সবাই।
'দিব্যধাম ধরণীর ধূলায় ধূলায়।

'হেরো অনাবৃত।
'মৃত্যু নাই, মৃত্যু নাই, নাই।'

স্বপ্ন শুধু মানবজীবন।
অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যৎআশা
বিমোহিনী মরীচিকা সমুখে পিছনে···
সত্য কভু নয়।
জীবনের যাত্রাশেষে তোমার আমার
মৃত্যু আছে। নাই প্রেম, নাই রে কোথাও
প্রেমের ঠাকুর।
দুষ্কৃতের সুকৃতের
ক্ষমা নাই, শাস্তি নাই, নাই পুরস্কার।
আশা বা নৈরাশ্য নাই।
অন্তরেও অন্তর্যামী আছে কোনোজন?
মুখর শ্রাবণশর্বরীতে
জাগিয়া শয্যায়
তারই দুটি চরণের ছোঁওয়া মেগেছিনু
ধুক্‌ধুক্‌ এই বুকে।
যুক্তকর সিক্তআঁখি কারে বলেছিনু,—
'তাই তো এসেছি
'সীমাহীন অন্ধকার দু হাতে ঠেলিয়া
'এ আলোয়, এ জীবনে।'

নীরন্ধ্র অন্তিম অন্ধকার ঘিরিছে আবার।
আলোকবুদ্‌বুদ এ জীবন
ক্ষণমাত্রে মিলাবে তাহাতে।

বোলপুর
১৬ আষাঢ় ১৩৪২

সৌরভ

দ্বারপ্রান্ত হতে বহে
সদ্যস্ফুট মল্লিকার-সৌরভসোহাগ।
একটি খদ্যোত ফেরে সিক্তমধুমালতীবিতানে।
নৈঃশব্দ্যের পাড়ে পাড়ে
ঝিল্লিস্বর সূক্ষ্ম কারু গাঁথে রাতের বসনে।
চন্দ্রতারা লুপ্ত করি
একখানি মেঘে সারা নীলাম্বর ছেয়ে
নিরন্তর পারিজাতরেণু বৃষ্টি করে।

স্তিমিতপ্রদীপালোকে কেন জেগে আছি?
দূরে, বহু দূরে,
বকুলকানন-ঘেরা নিভৃত কুটীরে
একখানি সুখস্বপ্ন করিব প্রেরণ
একখানি শয়নশিথানে :

ঝরা বকুলের গন্ধ-সাথে
মধুমল্লীমালতীর মিশিবে সোহাগ,
বাতায়নে চাঁদের আলোয়
বাজিবে অশ্রুত বৃষ্টিধারা,
অনাঘ্রাতপুষ্প-হেন সুন্দর অধর
অস্ফুট কী মন্ত্রজপে
শিহরি উঠিবে বার বার।

বোলপুর
১৮ আষাঢ় ১৩৪২

সার-সত্য

ভুলিয়া গিয়েছি ভাব, ভুলিয়াছি ভাষা।
জীবনের সার-সত্য ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা।
সুন্দরের মোহ আছে, মোহনিয়া বেশে
প্রাণ-পানে প্রাণখানি টানে হেসে হেসে।
প্রাণে প্রাণ মেশে
তারই তরে সকল আকূতি আশা ও নিরাশা।
জীবনের সার-সত্য ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা।

কথা কিছু বাকি নাই, বাকি আছে প্রাণ।
জাগিয়া রচেছি স্বপ্ন সারা নিশি, সারা দিনমান।
পড়েছিল ভোরে আলো, ঝরেছিল সাঁঝেতে বকুল—
ভেটিল সুবাসরাশি বাউল বাতাসে
আঁধার বনের কোন্ ফুল !
তাই মনোভুল—
স্বপ্নকেই সত্য ব'লে ভুলাইনু, ভুলেছিনু খাসা।
জীবনের সার-সত্য ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা।

পাশরিব এ চিরপশরা—
ভুলের এ ফুলগুলি, মনের এ মনোরথ ম্লান ঝ'রে-পড়া।
আঁধারের তীরে তীরে
পা টিপিয়া আসে ধীরে, আসে ধীরে ধীরে
নিষ্ঠুর মরণ মোর !
প্রেমসম কী জানি রে
নিখিলের সাগর'সঙ্গম— সেও সব, সেও সর্বনাশা !
মৃত্যুরে প্রেমই বুঝে, মৃত্যু শুধু বুঝে ভালোবাসা।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ রাত্রি

শেষ কথা

শেষ ভাষা দিতে চাই এই শেষ বার
হে বন্ধু আমার,
শুধু দিন দুয়েকের বিফল জীবনে।

না ছিল আমার মনে
বিত্ত গৃহ পরিবার যশের কামনা।
গৃহে মোর জন্ম দিয়ে, ভাগ্য অন্যমনা
আমায় করেছে গৃহহীন।
গৃহে পথ, পথে মোর গৃহ চিরদিন—
সেই পথ দিগন্তর-প্রান্তরে বিলীন।

আমার বলিতে কিছু নাই আগে পিছে।
অন্তরে বাহিরে স্বপ্ন তরঙ্গিয়া মিছে
অজ্ঞেয় ও অপরূপ পারাবার দোলে—
ওই দোলে জন্ম যদি মৃত্যু ওই কোলে।

তব প্রেম পাই নাই ব'লে,
তব প্রেম বিনা,
স্বপ্ন তো হল না সত্য। হে বন্ধু, জানি না
আবার গড়িবে কিনা লীলাচ্ছলে ভুলি
লবণজলধি হতে নুনের পুতুলি।

১৩৩৬

। শুদ্ধিপত্র ।

পৃ.	ছ.	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	১৭	পদে	পদে।
১০	১৯	বসিতে	বসিতে।
৩১	৮	বিসজি	বিসর্জি
৩৭	২৪	থাকবে	থাকিবে
৮০	২৭	উপহাস	উপহাসে
২৪৪	২৪	কোনো শিশু সেথা	সেথা কোনো শিশু
৯৩	২২	নিশাস	নিশ্বাস
১৩৮	২৮	ডগায়	ডগায়
১৪৩	১৯	মক	মূক
১৬৯	৫	দূরে	দূরে।
১৯৫	১৬	মেলে	মেলে।
২৫২	১৮	দোলায়িত	দোলাচল